KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ মাঘ, ১৩৬৭ ফাল্গুন, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা ৭

বহু শতাব্দী পূর্বে
যে পদ্ধতি ভারতবর্ষই
আবিষ্কার করেছিল .....

প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে সেই লৌহ স্তম্ভটি
নির্মিত হয় যাতে আজও মরচে
ধরেনি। তারও অনেক আগে থেকে শিল্প ও বিজ্ঞানের
নানা ক্ষেত্রে বহুবিধ আবিষ্কারের
জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত হয়েছিল। লৌহস্তম্ভটি
ধাতুবিদ্যার এক পরম বিস্ময়।
ভেষজ কেশতৈলও একটি প্রাচীন ভারতীয়
আবিষ্কার—যার গোপন তথ্য বহু শতাব্দী
অজ্ঞাতই র'য়ে গিয়েছিল। আধুনিক
বিজ্ঞানের গবেষণায় সেই তথ্যটি আবার
আবিষ্কৃত হয়েছে—যার ফলে বিশুদ্ধ ভেষজ
উপাদানে একটি কেশতৈল প্রস্তুত হচ্ছে—তার নাম কেয়ো-কার্পিন।

মনোরম গন্ধযুক্ত কেয়ো-কার্পিন চুলের গোড়ায়
স্বাভাবিকভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায়

কেয়ো-কার্পিন

ফলপ্রদ ভেষজ কেশতৈল

বে'জ মেডিকেল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ
পাটনা • গৌহাটি • কটক

IPB/K.KJ/2

অষ্টম বর্ষ। দশম সংখ্যা সমকালীন মাঘ তেরশ' সাতষট্টি

॥ সূচীপত্র ॥

পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগ্‌দর্শনী ॥ অমিয়নাথ সান্যাল ৫৯৩

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি ॥ সনৎকুমার রায়চৌধুরী ৬১০

মুদ্রাস্ফীতি ॥ প্রফুল্লকুমার সরকার ৬২৬

রবীন্দ্র-রচনা সূচী ॥ পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু ৬২০

রবীন্দ্র-রচনা সংকলন ৬২৩

অভিনয়ে স্বাভাবিকতা ॥ রবি মিত্র ৬২৬

সমালোচনা ॥ মঞ্জুলা বসু। নমিতা চক্রবর্তী

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩০

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

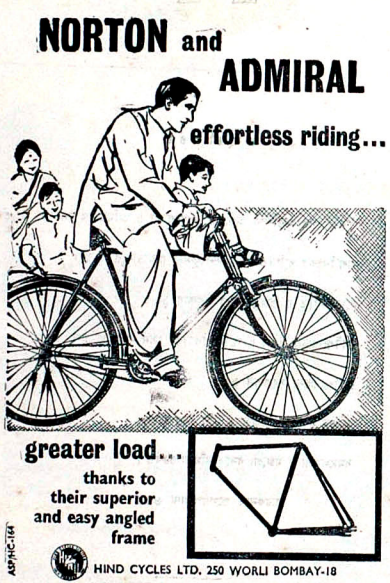

অষ্টম বর্ষ। দশম সংখ্যা সমকালীন মাঘ তেরশ' সাতষট্টি

পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগ্‌দর্শনী

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রের ৫ অঃ ২১ শ্লোকে পূর্বরঙ্গ কর্মের প্রাথমিক নয়টি অঙ্গ ঘটিত উপদেশ নিবৃত্ত হয়েছে। পরে, ২২ শ্লোক থেকে দ্বিতীয় বিভাগীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে উপদেশ আরম্ভ যথা,

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চোত্থাপনবিধিক্রিয়াম্।
যস্মাদুত্থাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দীপাঠকাঃ ।। ২২ ।।
পূর্বমেব তু রঙ্গেঽস্মিন্ তস্মাদুত্থাপনং স্মৃতম্।*

অর্থ। অতঃপর 'উত্থাপন' নামে কর্মের বিধিদৃষ্ট প্রয়োগ উপদেশ করব। যে হেতু বিশেষ করে পূর্বরঙ্গেই (নতু নাট্য কর্মে) নান্দীপাঠকগণ প্রয়োগকে উত্থাপিত (উপর্যুপরি ইষ্টক যোজনা দ্বারা ভিত্তি উত্থাপন ন্যায়ে) করেন, অতএব, এই পর্যায়-বিহিত কর্ম উত্থাপন নামে অভিহিত হয়েছে।

তাৎপর্য। 'তু' শব্দ দ্বারা মাত্র পূর্বরঙ্গ কর্মে অনুষ্ঠেয় "উত্থাপন" প্রয়োগ সূচিত। কারণ, পূর্বরঙ্গ পরীক্ষামূলক কর্ম। পরিণাম-নাট্য পূর্বরঙ্গ নয়, পরীক্ষামূলক ও নয়। সুতরাং নাট্যবিধির মধ্যে "উত্থাপন" প্রয়োগ বিহিত নয়।

প্রশ্ন। একজন নান্দীপাঠকই নান্দীপাঠ করেন। তিনি স্বয়ং সূত্রধার ("সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমস্বরমাশ্রিতঃ" ৫ অঃ ১০৬ শ্লোক)। তাহলে "নান্দীপাঠকাঃ" ইতি বহুবচনের সার্থকতা কিরূপ?

উত্তর। পূর্বরঙ্গ বারম্বার অনুষ্ঠেয়, পরীক্ষার্থে। মাত্র এক জন নান্দীপাঠকই বারবার নান্দীপাঠ করেন না। বহু নান্দীপাঠকের নান্দীপাঠ পরীক্ষা করে উৎকৃষ্ট একজন নান্দীপাঠক পরিণাম-নাট্যে নান্দীপাঠের উপযুক্ত রূপে নির্বাচিত হন।

গুণলক্ষণসমন্বিত (৩৫ অঃ) সূত্রধার অবশ্যই নান্দীপাঠ করেন, বা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে, কোনও নির্বাচিত নান্দীপাঠক (নান্দীপাঠের আণ্ডারস্টাডি) সেই বিশিষ্ট নাট্য পক্ষে তৎকালীন সূত্রধার পদে অভিষিক্ত হয়ে নান্দীপাঠ করেন। অর্থাৎ—বহু পাঠক পরীক্ষিত হন, এক জন (বা দু'জন) পাঠক নির্বাচিত হয়ে প্রস্তুত থাকেন।

নান্দী

নান্দী শব্দটী নাট্যগান্ধর্বের প্রাচীনতম গুর্বাচারসিদ্ধ নিরুক্ত বিশেষ। নান্দীর বস্তুলক্ষণ-প্রামাণিক সংজ্ঞা এস্থলে সর্বাগ্রে আলোচ্য। সংজ্ঞা যথা

আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে।
দেবদ্বিজনৃপাজীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা ।। ২৪, ২৫ ।।

অন্বয়মুখী অর্থ। যস্মাদ্ (অয়ং নান্দীপ্রয়োগঃ) নিত্যং (সর্ববিধ-নাট্যকর্মণি) দেবদ্বিজনৃপাদীনাং (নাট্যভূমিকাধীনানাম্ এব দেবদ্বিজনৃপতি প্রভৃতি সর্বপাত্রাণাং ইতি তেষাং প্রতি স্বস্বকর্মসু আগ্রহোৎসাভিনি—বেশাদ্দীপনার্থং ইত্যত্র অভিসন্ধেয়ম্) আশীর্বচন-সংযুক্তা (গুর্বাচার সিদ্ধদৈবাশীর্বাদবাক্য তেন সংপ্রযুক্তা বাণী এব ইতি) প্রবর্ততে (নাট্যপ্রারম্ভ বিশেষতয়া গম্যতে) তস্মাদ্ (হেতোঃ তাদৃশী দৈবী বাণী) নান্দী (মহেশ্বরানুচরঃ নন্দি স এব দিব্যসূত্রধারঃ তস্য জিহ্বায়াং লাস্যবত্যেব অভিব্যক্তিমতী বাক্ বাণী বা ইতি) সংজ্ঞিতা (নিরুক্তানুসারেণ কথিতা সা নান্দী) ইতি শেষঃ।

বিশদার্থ। **পরিণাম নাট্যকর্মের আরম্ভে তৎকর্মাধীন দেবতা, ব্রাহ্মণ, নৃপ প্রভৃতি যদ্‌ব্যবতীয় ভূমিকাপাত্রগণ স্বস্বকর্মে প্রস্তুত হলেও,** নাট্যারম্ভ মুখে তাঁদের প্রতি কিছু আশীর্বাদবচন প্রয়োগ করা উচিত। এতদ্‌দ্বারা সেই অভিনয়কারী পাত্রদের আগ্রহ উৎসাহ ও অভিনিবেশ পুনরুদ্দীপিত হয়। গুর্বাচার সিদ্ধ সেই প্রারম্ভিক আশীর্বচনই নান্দী নামে সংজ্ঞিত। কি হেতু "নান্দী" ইতি নাম? মহেশ্বরের প্রিয় অনুচর নন্দি। নাট্য গান্ধর্ব আরম্ভ হবে, এই বার্তায় নন্দি আনন্দিত হল। তৎক্ষণাৎ নন্দির জিহ্বাগ্রে বাণী লাস্যবতী হল। নন্দির জিহ্বাগ্রে লাস্যবতী বাক্ বা বাণী ইতি নান্দী বিষয়ক নিরুক্ত। নিরুক্ত অর্থে কি বুঝায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ফল কথা, ভূমিকাধারী দেব-দ্বিজ-নৃপাদিগণ আশীর্বাদ করেন না। এঁরা আবার কাকে আশীর্বাদ করবেন! কি হেতুই বা আশীর্বাদ করবেন! বরং—**নান্দীপাঠক সূত্রধারই দেবাদ্বিজ-নৃপাদি উপস্থিত ভূমিকাপাত্রগণের** প্রতি আশীর্বচন প্রয়োগ করেন।

ভরতোক্তর কালের কাব্যসাহিত্য মাত্র সেবী অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ লেখক বৃন্দ তাঁদের নিরতিশয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে নান্দীশব্দকে বলাৎ ও নিষ্প্রয়োজনে আকর্ষিত করে নান্দীর অন্তর্নিহিত নিরুক্ত ও গুর্বাচার সিদ্ধির অবলোপ সাধন করেছিলেন। সুতরাং, অলংকার-শাস্ত্রকার ও তদনুবর্তী কোষকারের স্বকপোলকল্পিত টীকা-ব্যাখ্যা দ্বারা নাট্যশাস্ত্রীয় নান্দী ব্যাখ্যাতব্য নয়। শ্লোকে "দেবদ্বিজনৃপাদীণাং" শব্দের 'দেব' ও 'আদি' শব্দের অর্থ সম্যক্ অনুশীলিত হয়নি বলেই স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা উদ্‌ভূত হয়েছিল। "দেবাদ্বিজনৃপাদীনাং" অর্থ "দেবাদ্বিজনৃপাদিকর্তৃক" নয়। "দেবাদ্বিজনৃপাদির প্রতি" ইতি সমুচিত ব্যাখ্যা। সূত্রধার ব্যক্তি উপস্থিত দ্বিজনৃপাদির প্রতি আশীর্বাদ প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু—"দেবপ্রতি সূত্রধারের আশীর্বচন" আদৌ বিকৃত ব্যাখ্যা। এবং 'আশীর্বচন' অর্থে তোষক বচনও নয়। নাট্যশাস্ত্রের মূলপাঠের অর্থ-তাৎপর্য উক্ত অলঙ্কার শাস্ত্র-লেখকদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি; যে কারণেই হক।

নান্দীশব্দের গুর্বাচারসিদ্ধি

নন্দি ইতি মূল শব্দ থেকে গুর্বাচারসিদ্ধ "নান্দী" শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছিল। নন্দি স্বয়ং দিব্যগণ অন্তর্গত বিশিষ্ট দিব্য পুরুষ। ৪ অধ্যায়ে মহেশ্বর-পার্বতীর নৃত্ত ঘটিত আখ্যায়িকা

* শ্লোকসংখ্যা চিহ্ন বিপর্যস্ত। এই ষটচরণ সমগ্রত একটি শ্লোক রূপে চিহ্নিত ও পঠিত হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গে (২৪৬ থেকে ২৪৯ শ্লোক) যে "নান্দিভদ্রমুখা গণাঃ" পঠিত, তার অর্থ "নন্দিভদ্রপ্রমুখ ভূতগণ সকল, যাঁরা পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তে যোগদান করেন নি"। নন্দিভদ্র অর্থ ভদ্রানুচর নন্দি; যথা বলভদ্র, বীরভদ্র। 'ভদ্র' অর্থে 'শিব'। অর্থাপত্তি যথা—অমরকোষে মঙ্গল=শিব=ভদ্র—কল্যাণ। নন্দির মুখ দিয়ে শিববাণী বা কল্যাণবাণী বা ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ইতি নন্দিভদ্র। মহাদেবের নিত্যসান্নিধ্যের কারণে নন্দিত ইতি নন্দি। নাট্যারম্ভ মাত্রেই ইনি বিশেষ ভাবে পুলকিত হন। ৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে "নন্দিনং চ গণেশ্বরান্" বাক্যে পূর্বোক্ত নন্দিই উল্লিখিত। পুনশ্চ ৫৯ শ্লোকে "নন্দীশ্বরপুরোগমাঃ" বাক্যের অর্থ 'নন্দীশ্বর যাঁদের নেতা'। এ স্থলে নন্দি ও নন্দীশ্বর একই ব্যক্তি; ঈশ্বর ইতি গৌরবার্থে। নন্দীশ্বর মহাগণেশ্বর ন্যক্তিদের প্রধান। শিবাধীন গণসকল ইতি 'মহাগণ'। গণ সকলের শ্রেণীগত ঈশ্বর বা নেতা, ইতি মহাগণেশ্বর। মহাগণেশ্বর সকলের মধ্যে নন্দীশ্বর হলেন পুরোগম। হরপার্বতী গান্ধর্বপ্রিয়। সুতরাং নন্দি ও গান্ধর্বপ্রিয়। কিন্তু, বিশুদ্ধ গান্ধর্বের প্রারম্ভে "নান্দী" ইতি আশীর্বচনের প্রয়োজন নেই। কারণ, গান্ধর্ব অভিনয়-সাধ্য কর্ম নয়। পুরাণ সকলের মধ্যে এবং অন্যান্য গ্রন্থেও ইতর-বিশেষ ভাবে উক্ত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে দেখা যায়, ঐতিহ্যগত বীজ থেকে পুষ্পফল পর্যন্ত একটি "মাইথলজি" সুপরিকল্পিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রীয় গুর্বাচার উক্ত পরিকল্পনাকে অনেকাংশে আশ্রয় করেছিল।

নান্দীর বস্তুলক্ষণ

বক্ষ্যমান শ্লোকে নান্দীর লক্ষণ বর্ণিত যথা

স্থায়িবর্ণাশ্রয়োপেতাং কলাষ্টকবিনির্মিতাম্।
সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ ॥ ১০৬ ॥ ৫ অঃ।

অন্বয়ব্যাখ্যা। মধ্যমং (মন্দ্রমধ্যতার স্থানানাং ঘন্ মধ্যমম এব সংস্থানং সপ্তকং বা ইতি তন্মধ্যমাশ্রিকৃতং মধ্যমং) স্বরং (পূর্বোক্ত মধ্যমস্থানভূতম্ এব কম্পিদ্ স্বরবিন্যাসং রাগোৎপত্তি-হেতুকম্ ইতিভাবঃ তমেব স্বরম্) আশ্রিতঃ সূত্রধারঃ তদেব স্বরবিন্যাসম আশ্রিত্য নান্দীং পঠেৎ গায়েৎ ইতি। নন্দ গীতপাঠয়োঃ কথম্ অত্র অভেদঃ ইতি তদ্‌চ্যতে স্থায়িবর্ণাশ্রয়ো পেতাম ইত্যাদি। গান্ধর্বসংগ্রহে ন তু নাট্যসংগ্রহাধিকৃতে পাঠ্য যোগে স্থায়াদিবর্ণচতুষ্টয়ম্ উপদিষ্টম্ তচ্চ ন স্থায়িনম এব গীতস্বরবর্ণম্ আশ্রিত্য নিষ্কর্ষেণ গৃহীত্বা চ নান্দী গেয়া ভবেৎ সূত্রধারেণ ইত্যবগন্তব্যম্। অত্র গান্ধর্বাধিকৃতস্য এব গানপ্রয়োগরহস্যস্য সূচনা। পুনরেব, তস্যাঃ নান্দ্যাঃ গেয়ত্ব বিশেষসূচনার্থং উপদিশতি কলাষ্টকবিনির্মিতাম্ এব তাদৃশীং নান্দীং সূত্রধারঃ গায়েৎ। গান্ধর্ববস্তুরচনার্থং লয়-তালভেদ ভিন্নাঃ কলাঃ উপদিষ্টাঃ তাসাং চ কেবলাষ্টকলাপ্রমিতা এব নান্দী গেয়বস্তু স্যাদ ইতি। এতাদৃশলক্ষণপ্রমাণ হেতুত্বাদ্ নান্দ্যাঃ গেয়ত্বম্ ইত্যেব অভিসন্ধিঃ ন তু পাঠ্যত্বম্ ইতি শেষঃ।

বিশদার্থ। **সূত্রধার (নির্বাচনসাপেক্ষ ভাবে) নান্দী পাঠ করেন অর্থাৎ নান্দী গান করেন।** গান ও পাঠ ভিন্ন রূপ কর্ম; এ স্থলে কি হেতু পাঠ=গান? বলা হয়েছে মন্দ্রাদি স্বরসপ্তক ত্রয়ের মধ্যম সপ্তক আশ্রয় করে ও নিশ্চিত রূপে গ্রহণ করে সূত্রধার নান্দী পাঠ করেন=গান করেন। স্বর বস্তু গেয়; পাঠ্য নয়। পুনশ্চ, সেই নান্দীর প্রমাণ লক্ষণ যথা "অষ্টকলা দ্বারা বিনির্মিতা" নান্দী ইতি। ৩১ অধ্যায়গত কাল, লয় কলা ও তাল গান্ধর্বেরই অধিকৃত সংগ্রহ-বস্তু; নাট্যসংগ্রহের বস্তু নয়। অতএব নান্দী প্রমাণন্যূনায়ী রূপে গান্ধর্বাধিকৃত রচনীয় বস্তু বিশেষ। সুতরাং গেয়। যদি বলা যায়, পদ বিনা গেয়বস্তুর সিদ্ধি হয় না, তদুত্তরে সর্বাপত্তি-নিরসনার্থ প্রথমেই বলা হয়েছে "স্থায়িবর্ণাশ্রয়োপেতাং নান্দীম্" ইতি। স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহী ও অবরোহী ইতি বর্ণচতুষ্টয় (২৯ অঃ)ষড়জাদি স্বরের (নতু কচটতপাদি পাঠ্য বস্তুর) তাৎকালিক কণ্ঠপ্রযত্নসম্ভূত গুণভেদ। নান্দীগানের পক্ষে স্থায়িবর্ণ যথাবিধি আশ্রয় করে ও

প্রযত্নগ্রাহ্য রূপে নিশ্চিত করে সূত্রধার নান্দী গান করেন। নান্দী যদি মূলতঃ বা প্রধানতঃ পাঠ্য হত, তাহলে উপদেশের মধ্যে পাঠ্যযোগাধিকৃত (১৯ অধ্যায়) পাঠ্যগুণসকল, বিশেষতঃ উদাত্তাদি পাঠ্যবর্ণ চতুষ্টয়ের কোনও একটির উল্লেখ থাকত। কিন্তু, উল্লেখ নেই।

প্রসঙ্গত, গেয়পদ মাত্রেরই কিছু না কিছু পাঠ্যত্ব আছে। যথা, পায়স মাত্রেরই মিষ্টান্নত্ব আছে, যে হেতু পায়সের মিষ্টত্ব আছে, পায়সের মধ্যে তণ্ডুলও আছে। কিন্তু, পায়সকে মিষ্টান্ন বলা হয় না। কারণ, পায়স ক্ষীরপাক বিশেষ, অন্নপাক বিশেষ নয়। অনুরূপ হেতুতে, নান্দীর পদত্ব ও নান্দীপদের পাঠ্যত্ব ইতি সাধারণ গুণে স্বীকৃত হলেও, নান্দী পাঠ্য নয়; নান্দী গেয়।

নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম নাট্যগান্ধর্ব বিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট আধার-শাস্ত্র। "নান্দী" শব্দ, নান্দীপ্রয়োগের উদ্দেশ্য, নান্দীর প্রমাণ-লক্ষণ সর্বপ্রথম ও সম্যক্‌ভাবে নাট্যশাস্ত্রেই উপদিষ্ট। এতৎসমস্ত বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত হয়, যথা **নান্দী স্বরূপতঃ গেয় বস্তু**, এবং **এর বিষয় হল গুর্বাচার সিদ্ধ আশীর্বাণী।** সূত্রধার নামে পুরুষ বিশেষ নান্দীর গায়ক। নান্দীরচনাকারী ব্যক্তি কবি হতে পারেন, এবং নিজকৃত রচনা পাঠও করতে পারেন। কিন্তু সেই রচনার আবৃত্তিকে নান্দীপ্রয়োগ মনে করার লেশমাত্র কারণ নেই।

তাহলে, পরবর্তী কালের, (এবং এখনও প্রচলিত সংস্কৃতানুশীলনমুখী বিদ্যায়তন সকলের কাব্যসাহিত্য পঠনপাঠন কালে) অলংকারবিশারদগণের ধারণায় "অষ্ট বা দ্বাদশপদ-বিরচিত ইতি নান্দী" আবির্ভূত হল কিরূপে কোথা হতে?

উত্তর। নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেই অপর এক প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "অষ্ট বা দ্বাদশপদ বিরচিত বস্তু"। এস্থলে নান্দীপ্রয়োগের প্রসঙ্গ নয়। যথা, উক্ত নান্দীলক্ষণ ঘটিত ১০৬ শ্লোকের অব্যবহিত পরে ১০৭ শ্লোকে— ততঃপদৈ দ্বাদশভি রষ্টাভির্বাপ্যলঙ্কৃতাম্। ইত্যাদি। "ততঃ" অর্থাৎ পূর্বোক্তলক্ষণযুক্ত নান্দীপ্রয়োগের পরে কিছু করণীয় বিশেষ সূচিত। এই তদনন্তরপ্রযোজ্য রচনা অষ্ট বা দ্বাদশ পদ দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। এই রচনা পাঠ্য; কদাপি গেয় নয়। রচনার অভিপ্রায় হল (ক্রমান্বয়ে ১০৭ শ্লোক থেকে ১১১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) সর্বদেবতা, সর্বব্রাহ্মণ, মহারাজ, প্রেক্ষকবর্গ ও কাব্যকারবর্গের (যাঁরা নাট্যযোগ্য কাব্যবন্ধ রচনা করেন) প্রতি **নমস্কার ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনা; এ'দের প্রতি আশীর্বচন নয়।** 'নমোঽস্তু' দিয়ে আরম্ভ; "দ্বিজাতিভ্যশ্চ বৈ নমঃ" ইতি; পর শেষ যথা —

প্রেক্ষাকর্তুর্মহান্ ধর্মোভবতু ব্রহ্মভাবিতঃ।
কাব্যকর্তুর্যশশ্চাস্তু ধর্মশ্চাপি প্রবর্ধতাম্ ।।
ইজ্যয়া চানয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি।
নান্দীপদান্তরেষ্বেষু হ্যেবমাশ্বিতি নিত্যশঃ ।।

সমগ্র ব্যাপারটি যথা—সূত্রধার পূর্বোক্তলক্ষণসমন্বিত নান্দী পদ গান করবেন। এর পরে, অষ্ট বা দ্বাদশপদ দ্বারা রচিত স্বস্তিবাচন ও পাঠ করবেন। এই স্বস্তি বাচন নান্দী নয়। কিন্তু, নান্দী ইতি গেয় পদের অব্যবহিত পরে পঠনীয় এই স্বস্তি বাচন নান্দীপদের অলঙ্কার স্বরূপ। যথা, উত্তমা সুলক্ষণা পয়স্বিনী গাভীকে গৃহে আমন্ত্রণ কালে তার কপালে সিন্দুর-লেপ, শৃঙ্গমূলে তৈল-হরিদ্রা দান, এবং গলদেশে মাল্য আরোপন ইত্যাদি রূপে অলঙ্কৃত করা উচিত, সেরূপ নান্দী ইতি গেয় পদ বিশেষ স্বরবর্ণাদি দ্বারা গান করে, পরে অষ্টদ্বাদশপদ দ্বারা রচিত স্বস্তি বাচন প্রয়োগ করা উচিত; এই রূপে নান্দী অলঙ্কৃতা হন। সিন্দুর-লেপ, তৈল-হরিদ্রা ও মাল্য যেমন বস্তুত গাভী নয়, কিন্তু, সুলক্ষণা গাভীর অলঙ্কার-স্বরূপ, এস্থলে স্বস্তিবাচনও বস্তু নান্দী নয়, কিন্তু সুলক্ষণা নান্দীগীতের অলঙ্কার স্বরূপ। সূত্রধার স্বয়ং

নান্দীগানকে এরূপ স্বস্তি বাচনদ্বারা অলঙ্কৃত করবেন। এই হল ভরত মুনির উপদেশের অভিসন্ধি।*

ভরতোত্তর কালের কাব্যসাহিত্য রচয়িতাগণ, নাটক রচয়িতাগণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণেতাগণ নান্দী নামে গেয়বস্তুর অস্তিত্ব, গীতরূপ ও প্রমাণ-লক্ষণ সকল বুঝতে পারেন নি। কিন্তু—অষ্ট-দ্বাদশপদ দ্বারা রচিত স্বস্তিবাচন ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করে, এই ব্যাপারকে নান্দী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ'রা মূল নাট্যশাস্ত্র পাঠ করেছিলেন কিম্বা করেননি, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু, গড্ডালিকা প্রবাহ ন্যায়ে উক্ত ভ্রমাত্মক ধারণা এতাবৎকাল পর্যন্ত বর্তিত হয়ে এসেছে।

পরবর্তী শ্লোকে (২৩-২৪ শ্লোক, বিপর্যস্ত) 'পরিবর্তন' নামে পূর্বরঙ্গীয় প্রয়োগ বিশেষের প্রসঙ্গ। যথা

পরিবর্তন

যস্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্ ॥ ২৩ ॥
নন্দনানি প্রকুর্বন্তি তস্মাত্তু পরিবর্তনম্ ॥ ২৪ ॥ ৫ অঃ।

অর্থ। যে হেতু পূর্বোক্ত নান্দীপাঠকগণ লোকপাল ইতি বিশিষ্ট দেবতা সকলের উদ্দেশ করে চতুর্দিকে সম্মিলিত বর্তনাপূর্বক বহু বন্দনা সকল প্রয়োগ করেন, অতএব, এই পরি-বর্তমান বন্দনাকার্য পরিবর্তন নামে অভিহিত হয়েছে।

লোকপাল দেবতাগণের সংখ্যা নাম ও নির্দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মত-ভেদ ছিল। নাট্যগান্ধর্বের ঐতিহ্যে কোন্ কোন্ দেবতা লোকপাল ইতি সাধারণ শ্রেণীতে গণ্য হয়েছিলেন জানা যায় না। যাই হক, যখন 'চতুর্দিশম্' শব্দ দ্বারা সামান্যতঃ দিগ্‌দর্শিত হল, তখন চারিদিকের চারজন লোকপাল মনে করলেই যথেষ্ট।

নান্দীপাঠক রূপে যাঁরা সমুপস্থিত তাঁরাই নান্দীপ্রয়োগের পূর্বে এই পরিবর্তপ্রয়োগ করলেন। পরিবর্তন প্রয়োগের পরে নান্দীপ্রয়োগ হবে। যথা,

আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥

এই শ্লোকটি পূর্বেই সম্যক্ আলোচিত হয়েছে। অতঃপর, নান্দীপাঠ সমাপনান্তে শুষ্কাপকৃষ্টা প্রয়োগ বিহিত।

শুকাপকৃষ্টা, শুষ্কাবকৃষ্টা ধ্রুবা

যত্র শুষ্কাক্ষরৈরেব হ্যপকৃষ্টা ধ্রুবা যতঃ।
তস্মাচ্ছুষ্কাবকৃষ্টেব জর্জর শ্লোক দর্শিতা ॥

---

* শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ., মহোদয়ের সঙ্গে এই অষ্ট-দ্বাদশপদ আলো-চনার অবসরে তিনি উক্ত "ততঃ" আদি ও "হ্যেবমাশ্বিতি নিত্যশঃ" ইত্যন্ত স্তরের মধ্যে মূল পাঠ্য বস্তুর অষ্ট-দ্বাদশ চরণবত্ত্বার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এটি সদ্যঃপ্রাপ্ত সৌভাগ্য! বস্তুত, অষ্টপদ = ২ পূর্ণ শ্লোক; দ্বাদশপদ = ৩টি পূর্ণশ্লোক। সুতরাং ভরত মুনির অভিপ্রায় এই যে, ন্যূনপক্ষে দ্বিশ্লোকী স্তুতিবাচন, অথবা ঊর্ধ্বপক্ষে ত্রিশ্লোকী স্তুতিবাচন দ্বারা গেয়া নান্দীকে অলং-কৃত করা উচিত। ভারত মুনি স্বয়ং নমুনা রেখে গিয়েছেন! শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পণ্ডিতসুলভ দৃষ্টি ও মৎসদৃশ এই সামান্য বিদ্যার্থীর প্রচেষ্টার প্রতি উদারসহানুভূতি জন্য তাঁকে ধন্যবাদ করি।

অন্বয় ব্যাখ্যা। যত্র (যস্মিন এব পরিণামনাট্যে) শুষ্কাক্ষরৈঃ (নীরসা গেয়া অপকৃষ্টা ধ্রুবা ইতি) যতঃ (যস্মাদেব প্রয়োজনবশাৎ) ধ্রুবা (নিবন্ধ গীতিবিশেষঃ স এবাত্র ধ্রুবা-শব্দেন লক্ষ্যতে ইতি) অপকৃষ্টা (স্বরাপকর্ষণসম্ভূতা অত্র সপ্তস্বরাণাং স্বরত্রয়বিশেষস্য লোপঃ অপকর্ষণং ইতি তাদৃশেন প্রকারেণ অপকৃষ্টা ধ্রুবা প্রয়োজ্যা ভবতি, তস্মাদ্ (অনুরূপ প্রয়োজন-বশাৎ) জর্জরশ্লোকদর্শিতা (জর্জরঃ ইন্দ্রদন্ডং তম্ উদ্দিশ্য শ্লোকঃ স্তুতিবাক্য বিশেষঃ তজ্জর্জরশ্লোকেন দর্শিতা অভিব্যক্তা ধ্রুবা ইতি উহ্য) তাদৃশী এব ধ্রুবা শুষ্কাবকৃষ্টা (পূর্বোক্তায়াঃ অপকৃষ্টায়াঃ এব ধ্রুবায়াঃ পূর্বরঙ্গ-সংক্ষেপবশাৎ পুনরপি অবকর্ষণসাধ্যা শুষ্কাবকৃষ্টা ভবেদ্ ইতি। এষঃ প্রয়োগঃ শুষ্কাবকৃষ্টা ইতি নামেন স্মৃতঃ, নতু অপকৃষ্টা ধ্রুবা-নামেন ইত্যবগম্যতে।

বিশাদার্থ। শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবা গীতি যথা প্রয়োজন বশে নাট্যকর্মে প্রযোজ্য (৩২ অঃ)। শুষ্ক অক্ষর দ্বারাও ধ্রুবা গীতি মধ্যে; পুনরায় কোমল বা সরস অক্ষররচনা দ্বারাও ধ্রুবাগীতি সাধ্য। অতঃপর শুষ্ক রচনা যদি চতুঃস্বর মাত্র দ্বারা বিন্যস্ত হয়, তাহলে তাকে শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবাগীতি বলে। ইতি নাট্যযোগ্য অপকৃষ্টা ধ্রুবা।

সম্প্রতি পূর্বরঙ্গীয় পরীক্ষার্থে উক্ত শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবা শ্রেণীর গীতির মধ্যে অগ্রে জর্জরস্তুতি ঘটিত গীতি বিশেষের প্রসঙ্গ। অবশ্য, সর্বপ্রথম বারপূর্বরঙ্গে জর্জরশ্লোকরচিত শুষ্কাপকৃষ্টা ধ্রুবাই গেয় বা প্রযোজ্য এবং পরীক্ষণীয়। জর্জরশ্লোকঘটিত এই ধ্রুবাগীতির পক্ষে বাদ্য সহযোগও থাকে না। একে শুষ্কাপকৃষ্টা, তার উপর বাদ্যসহযোগ বর্জিত। এবং নান্দীপ্রযোক্তা ব্যক্তিরাই এই জর্জরঘটিত শুষ্কাপকৃষ্টা গীতি গান করেন। সুতরাং, এই পুনর্বার অপকর্ষণ হেতুতে একে "শুষ্কাবকৃষ্টা" প্রযোগ বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৩২ অধ্যায়ে ধ্রুবাগীতির যে গায়ক-গায়িকাদের গুণলক্ষণ বর্ণিত হয়েছে (৪৫৯ শ্লোক থেকে ৪৬১ শ্লোক পর্যন্ত) **সেই উত্তম গায়ক-গায়িকা গণ কদাপি এই শুষ্কাবকৃষ্টা ধ্রুবা গান করেন না।** এঁরাও গান-যোগ্যতার পরীক্ষা দেবেন; কিন্তু, অনেক পরে, অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থবার আরব্ধ পূর্বরঙ্গে। পরীক্ষার বিধিক্রম ৫ অধ্যায়ের শেষাংশে উপদিষ্ট হয়েছে।

যে হেতু অত্র ধ্রুবা ও অপকৃষ্ট ধ্রুবা প্রসঙ্গীভূত হয়েছে অতএব এই দুই ব্যাপার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উচিত মনে করি। প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি। **এই ধ্রুবার সঙ্গে ১৪ শতাব্দীতে উদ্ভূত 'ধ্রুবপদ' গানের কোনও ঐতিহাসিক বা অঙ্গাগীসম্বন্ধ নেই *।**

নাট্যশাস্ত্রীয় ধ্রুবা ও অপকৃষ্ট ধ্রুবা

নাট্যে প্রযোজ্য বহুবিধ গীতরূপের মধ্যে ধ্রুবা-গীতি অন্যতম ও প্রধান। গীতবাদ্য দ্বারা রসভাব উদ্যোতনার মূলে গান্ধর্বসংগ্রহানুগত নিয়ম উপদিষ্ট হয়েছে (২৯ অঃ)। এবং—ধ্রুবা গীতির উপযোগী পদরচনা ও ছন্দঃকলাযোজনা বিষয়ে নিয়ম যথাক্রমে ৩২ ও ৩৩ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হয়েছে। স্বর, পদ ও তাল বিষয়ক নিয়ম দ্বারা সুনিবদ্ধ গীতই ধ্রুবা গীতি (বা ধ্রুবা গীত)। ধ্রুব নামে প্রসিদ্ধ নক্ষত্র যেমন দিক্ বিশেষকে নির্ণীত করে, অনুরূপভাবে নাট্যের

* অভিন্ন শব্দ বা অংশত সদৃশ শব্দ দৃষ্টে এবং 'কোটেশন্-মার্কা' উদ্ধৃতি মাত্র সম্বল করে আধুনিক এক শ্রেণীর সঙ্গীত-গবেষক আধুনিক ধ্রুবপদ গান বা তথাকথিত মার্গ-সঙ্গীতকে বেদের গর্ভ থেকে টেনে বার করার চেষ্টা করেন।' ঐতিহাসিক দৃষ্টি বলতে এঁরা কিছুই মানেন না। মানেন শুধু শব্দ-রূপের অভিন্নতা ও সাদৃশ্য। এঁরা বহু বহু ভ্রান্ত মত প্রচারের জন্য দায়ী।

বিভিন্ন অঙ্কে প্রযোজ্য ধ্রুবা গীতি তদঙ্কনিষ্ঠ রস-ভাবের দিক্ নির্ণীত করে, ইতি ধ্রুবা শব্দের নিরুক্ত। অঙ্কগত ইতিবৃত্তের বিশেষতঃ সন্ধি ও পতাকা স্থানে বর্তমানও ভাবী ঘটনার, তথা রসান্তর ও ভাবান্তরের দিঙ্‌নির্ণয়কারী এই "ধ্রুবাগীতি" ব্যাপার একমাত্র নাট্যশাস্ত্রেরই অমূল্য উপহারস্বরূপ। অঙ্কস্থ শ্রব্য দৃশ্যানুযায়ী কিরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিরূপে গীত রচনীয়, এবং কোন্ "জাতিরাগ" বা "সাধারণ" স্বরবিন্যাস দ্বারা যোজনীয়, ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধর্ব সংগ্রহে যে বাস্তব উপদেশ আছে, তার প্রধানতম অংশ ধ্রুববিধির অন্তর্ভুক্ত।

উৎকৃষ্ট ধ্রুবাগীতির পক্ষে প্রধানতঃ ষড়জাদি সপ্তস্বর এবং গৌণতঃ অধিকন্তু সাধারণ স্বর (২৮ অঃ স্বরসাধারণ প্রসঙ্গ) প্রয়োজনীয়। তৎসত্ত্বেও, কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট ধ্রুবাগীতি রচনার পক্ষে ছয়, পাঁচ ও চার স্বর প্রয়োগের বিধি আছে। অতঃপর চার থেকে ও ন্যূনতর সংখ্যক স্বর দ্বারাও অবকৃষ্টাবিশেষ ধ্রুবার বিধান সংকেতিত হয়েছে। অপকৃষ্ট ইতি সাধারণ স্থলে অব-কৃষ্টাই বিশেষ। অবকৃষ্টা ধ্রুবারও প্রয়োজন ঘটে।

মতঙ্গ নামে সংগ্রহশাস্ত্র ব্যাখ্যাকারদের অন্যতম প্রাচীন গীতবিশারদ তৎপ্রণীত বৃহ-দ্দেশী গ্রন্থে ভরত মুনির নামোল্লেখ পূর্বক একটি উপদেশবাক্য উদ্ধৃত করেছেন,—

ষট্‌স্বরস্য প্রয়োগোঽস্তি তথা পঞ্চস্বরস্য চ।
চতুঃ স্বরপ্রয়োগোঽপি হ্যবকৃষ্টধ্রুবাস্বপি ॥

অর্থাৎ ভরতমতে ছয়, পাঁচ এমন কি চারস্বর দ্বারাও **অবকৃষ্টা ধ্রুবা** প্রযোজ্য হতে পারে। তাহলে অপকৃষ্ট ধ্রুবা ও অবকৃষ্ট ধ্রবার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ? প্রশ্নের উত্তরে মতঙ্গ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করে বলেছেন "অনিয়মাৎ শ্রুতিমাত্রমত্র গ্রাহ্যম্"। অর্থাৎ অপকৃষ্টা ধ্রুবা ছয়, পাঁচ বা চার স্বর যোজিত হলেও গান্ধর্বানুগত নিয়ম দ্বারা নিবদ্ধ। কিন্তু, "অত্র" অর্থাৎ অবকৃষ্ট-বিশেষের প্রসঙ্গে "অনিয়মই" লক্ষ্য। তাহলে সেই অবকৃষ্টার শিক্ষা-দীক্ষা-প্রয়োগ কিরূপে সাধ্য? তদুত্তরে বলেছেন "শ্রুতিমাত্রম্" ইত্যাদি। "শ্রুতিমাত্র" অর্থাৎ "যেমনটি শোনা তেমনটি গ্রহণ, অনুকরণ ও প্রয়োগ"। এ স্থলে "শ্রুতি" অর্থে ২২ শ্রুতির নয়। শ্রুতি অর্থে শ্রবণঘটনা। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করে মতঙ্গ বলেছেন "চতুঃস্বরাঃ প্রভৃতি ন মার্গাঃ শবরপুলিন্দকাম্বোজ-বঙ্গাঙ্গ কিরাত বাহ্লীকান্ধ্রদ্রবিড়বনাদিষু প্রযুজ্যতে।" অর্থাৎ চার-পাঁচ-ছয় স্বরের অবকৃষ্টা ধ্রুবা নাট্যপ্রযোজ্য হলেও গান্ধর্ববিধান মার্গের অধিকৃত নয়। নাট্যের অঙ্কীভূত হয়ে শবরপুলিন্দ কাম্বোজ ইত্যাদি বনবাসী ভূমিকাশ্রিত গীতের পক্ষে এ সকল অবকৃষ্টা ধ্রুবা প্রযোজ্য হতে পারে। উক্ত বনবাসী লোকেরা গান্ধর্ববিধান জানে না। এই প্রকার অবকৃষ্ট ধ্রুবার প্রযোগের প্রয়োজন ঘটলে, অর্থাৎ নাট্যস্থ শ্রব্যদৃশ্যের মধ্যে কোনও অরণ্যবাসী স্ত্রীপুরুষের ভূমিকায় গীত প্রযোজ্য হলে সেই সেই অরণ্যবাসীরা বস্তুত যে রকম স্বরবিন্যাস দিয়ে গান করে ঠিক সেই রকম স্বর-বিন্যাস অনুকরণ করা উচিত।

সার কথা এই যে ছয় বা পাঁচ বা চার স্বরের অপকৃষ্টা ধ্রুবা এবং অবকৃষ্টা ধ্রুবা উভয়ই প্রযোজ্য হতে পারে, নাটকীয় ইতিবৃত্ত অনুসারে। কিন্তু, অপকৃষ্টা ধ্রুবা হল "আন্‌সফিস্‌টি-কেটেড্ স্কেইল্"। এই হল পার্থক্য। ফলে অপকৃষ্টা ধ্রুবাগীতির সঙ্গে গান্ধর্বানুযায়ী বাদ্য-সহযোগ বিধেয়। এবং অবকৃষ্টা ধ্রুবাগীতির সঙ্গে গান্ধার্বানুযায়ী বাদ্যসহযোগ প্রয়োজনীয় নয়।

অতঃপর, অপকৃষ্টা ধ্রুবা শুষ্কাক্ষর-রচিত হতে পারে; যথা নানা প্রকার বিচিত্র দেব-দেবতার উদ্দেশ-সহকৃত স্তোত্র প্রভৃতি। পুনশ্চ সরসাক্ষর রচিত বা সুশ্রব হতে পারে ঃ যথা

২৯ অধ্যায়ে উপদিষ্ট মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা শ্রেণীর গান সকল। ভরত মুনির উপদেশ এই যে—এই সকল গান ধ্রুবারচনা বিধির বহির্ভূত হলেও এদের সঙ্গে গান্ধর্ববিধানানুযায়ী সাধারণ বাদ্যসহযোগ থাকা উচিত (২৯ অঃ ৮০ শ্লোক "এতাস্তু গীতয়ো জ্ঞেয়া ধ্রুবাযোগং বিনৈব হি। গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্তু নিত্যং গানপ্রযোক্তৃভিঃ ।।)।

এই হল ধ্রুবা গীতি, অপকৃষ্টা ধ্রুবা ও অবকৃষ্টা ধ্রুবার সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পরিচয়।

শুষ্কাক্ষর

নীরস কণ্ঠে উচ্চারিত অক্ষর (ক-কারাদি অক্ষর, যথা কাকালি-ভেকালি) শ্রবণে শুষ্ক মনে হয়। কণ্ঠ সরস হলেও, খ-ছ-ঠ-থ-ফ, ঘ-ঝ-চ-ধ-ভ ও 'ক্ষ' অক্ষরগুলি শুষ্ক। পরিশেষে, তন্ত্রীবাদ্য ও সুষির-বাদ্যের (বেণু-বংশী বাদ্য) সহযোগ না থাকলে, সরস সুশ্রব অক্ষর ও গীত নীরস প্রতীত হয়। ৩২ অধ্যায়ের শেষের দিকে কণ্ঠের সরস-নীরসতা পরীক্ষার বিষয়ে ভরত মুনি উৎকৃষ্ট উপদেশ করেছেন। সম্প্রতি প্রসঙ্গ বিস্তার উচিত হবে না।

৩২ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঋক্-গাথা-পাণিকা প্রভৃতি স্তোত্র গেয়স্থলে কোনও রূপ বাদ্য সহযোগ হবে না। এগুলি প্রধানত অবকৃষ্টা ধ্রুবার শ্রেণীভুক্ত।

এখন পূর্বরঙ্গীয় বিধানে প্রথম বার অনুষ্ঠেয় এই শুষ্কাপকৃষ্টা, শুষ্কাবকৃষ্টা ও জর্জরশ্লোকদর্শিতা ধ্রুবা প্রয়োগের তাৎপর্য অনুসরণ করা যাবে।

"জর্জরশ্লোকদর্শিতা" অর্থ জর্জরশ্লোকরূপে রচিতা, এবং জর্জরশ্লোকপ্রমুখী। সর্বপ্রথমে ও বাদ্যসহযোগ বিনা জর্জর শ্লোকভূতা শুষ্কাবকৃষ্টা প্রয়োগ করা ও পরীক্ষা করা উচিত। পরে, অন্যান্য শুষ্কাবকৃষ্টা ধ্রুবাও প্রয়োগ-পরীক্ষাধীন করা উচিত।

অতঃপর, জর্জরশ্লোকপুরস্কৃত শুষ্কাবকৃষ্টা ধ্রুবা প্রয়োগের পরে "রঙ্গদ্বার" প্রয়োগ বিহিত হয়েছে।

রঙ্গদ্বার

যস্মাদ ভিনয়স্তত্র প্রথমং হ্যবতার্যতে।
রঙ্গদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্ ।।

অন্বয়ব্যাখ্যা। তত্র (পূর্বরঙ্গবিধৌ এব পরীক্ষানিমিত্তং নতু নাট্যকর্মবিধৌ অভিনয়-প্রযোগনিমিত্তং ইতি) যস্মাৎ (যদবসরবশাৎ অত্র শুষ্কাবকৃষ্টধ্রুবাপ্রযোগানন্তর্যং হি সূচিতম্ ইতি) প্রথমং (পূর্বরঙ্গ কর্মসু এব প্রথমবারং) অভিনয়ঃ (বাগঙ্গাদিভেদভিন্নঃ অভিনয়ং তৎ পরীক্ষার্থম্ ইতি) হি অবতার্যতে (ক্রমেণ আরভ্যতে উদ্‌গৃহ্যতে বা) অতঃ (আস্মাদ্ ক্ষণাৎ এব) বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্ (কেবল বাচিকাঙ্গিকাভিনয়লক্ষিতম্ এব হি ন তু সত্ত্বাহার্যাভিনয়লক্ষিতম্) রঙ্গদ্বারং (প্রথমবারাভিনয়কর্ম-প্রবেশকৃত্যং তন্নামসিদ্ধং রঙ্গদ্বারং আরভনীয়ং ইতি) জ্ঞেয়ম্ (পূর্বরঙ্গ প্রযোগীনাং বিজ্ঞেয়ম্ ইতি শেষঃ)।

বিশদ অর্থ। শ্লোকের 'প্রথমং' ও 'বাগঙ্গাভিনয়াত্মকং' ইতি শব্দ দ্বয় অর্থ-তাৎপর্যের সূচক।

পূর্বরঙ্গ কর্মে পরীক্ষাক্রম বিধির সৌষ্ঠবতা সম্পাদনার্থে বলা হয়েছে, সর্বপ্রথমবার অনুষ্ঠেয় পূর্বরঙ্গে অভিনয়মূলক কর্মও পরীক্ষণীয়। যথা সর্বপ্রথমবারে চাররকম অভিনয়প্রযোগের মাধ্যে **মাত্র বাচিক ও আঙ্গিক প্রযোগ দ্বয় মিলিত ভাবে প্রযোজ্য ও পরীক্ষণীয়।** এই পূর্বরঙ্গ প্রয়োগকে 'রঙ্গদ্বার' বলা হয়েছে। 'রঙ্গ' অর্থাৎ অভিনয়কর্ম-চতুষ্টয়। সর্বাগ্রে বাচিক ও আঙ্গিক প্রযোগ পরীক্ষোত্তীর্ণ হলে, সেই সেই প্রযোগী ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় পূর্ণাঙ্গ অভিনয়-যোগ্যতার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন। বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ না হলে সেই

প্রযোগী ব্যক্তি পূর্ণরূপ অভিনয় কর্মে পরীক্ষার যোগ্যতা লাভ করে না। কারণ, পূর্ণরূপ অভিনয় কর্মের অর্থাৎ বাচিক আঙ্গিক সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয় কর্মের মূলেও বাচক-আঙ্গিক সিদ্ধি থাকতে বাধ্য। যে লোক ভাত রাঁধতে জানে না, সে কখনও পোলাও রাঁধবার পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে না। ইতি নিতান্ত সহজ সাধারণবুদ্ধির কথা। এই হেতুতেই "প্রথমং হি অবতার্যতে" ও "রঙ্গদ্বারং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্" বলা হয়েছে। পূর্বরঙ্গকর্ম হল ভবিষ্যতে সাধনীয় নাট্যকর্মের পূর্বে অপরিহার্য রূপে প্রযোগ-পরীক্ষামূলক কর্মবিধি।

অন্যপক্ষে, "এই রঙ্গদ্বার পর্যায় থেকেই রঙ্গ বা নাট্য কর্ম আরম্ভ হওয়া উচিত" ইতি সিদ্ধান্ত যে কি পরিমান হাস্যকর ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, যথা সংক্ষেপে আলোচ্য। রামাভিষেক-সংক্রান্ত নাট্য আরম্ভ হল। রামের ভূমিকাধারী অভিনেতা রঙ্গপীঠে প্রবেশ করলেন। কিন্তু—রাজবেশ থাকবে না! কারণ, রঙ্গদ্বারে অভিনয় হবে আহার্য (বেশাভরণকেয়ূরকুন্ডলমুকুটাদি) অভিনয় ব্যতিরেকে! মনে করা যাক্ ভূমিকাধারী ব্যক্তিটি টোলের যুবাবয়স্ক বিদ্যার্থী। তিনি রামভূমিকা অভিনয় নিমিত্ত রঙ্গপীঠে আবির্ভূত হবেন, উন্মুক্ত ও শিখাযুক্ত মস্তকে; তার কণ্ঠে স্বর্ণ হার নেই, কর্ণে রাজকুমারোচিত কুন্ডল নেই! পরিধানে সম্মুখ-পশ্চাতে কচ্ছবদ্ধ সাধারণ বস্ত্র এবং গায়ে একটি ফতুয়া! কি হেতু এরূপ অভিনয়বৈচিত্র্য? যে হেতু "সাহিত্য দর্পণ" লেখক, তথা অন্যান্য পকেট-দর্পণ প্রবন্ধকারেরা ফতোয়া দিয়েছেন "এই রঙ্গদ্বার পর্যায় থেকেই নাট্যাভিনয় আরভ্য, এবং উক্ত প্রয়োগে মাত্র আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় থাকবে।" সংস্কৃত কাব্যানুশীলন-মূলক পঠন-পাঠনের ধারায় এই অদ্ভূত গড্ডলিকা-প্রবাহ আগত হয়েছে, বহু কাল থেকে। হাস্যকর নিশ্চয়, তবে দুঃখের হাসি।[1] ভরত মুনি কি এতই নির্বোধ ছিলেন যে "রঙ্গদ্বার পর্যায়ে নাট্যারম্ভ হক" বলে নট-নটীদেরকে ভূমিকানুযায়ী সজ্জাকরণের সময় না দিয়েই রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হওয়ার ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন!

ভরত মুনির উপদেশের নির্গলিত সার হল, প্রথমবার পূর্বরঙ্গে চতুরঙ্গ (আঙ্গিক, বাচিক সাত্ত্বিক ও আহার্য) অভিনয় নিদর্শিত করা উচিত নয় কারণ এরূপ কৃত হলে প্রয়োগ-কর্মের বিশিষ্ট গুণ-দোষ পরীক্ষা করা অসম্ভব। অতএব প্রথমবার সাধনীয় পূর্বরঙ্গে ভূমিকাভিনেতা-গণ সংকল্পিত নাট্যের মাত্র আঙ্গিক-বাচিক অংশদ্বয়ই নিদর্শিত করবেন।

প্রথম বারের যোগ্য 'রঙ্গদ্বার' পর্ব সম্পন্ন হলে এর পরেই 'চারী' ও 'মহাচারী' নামে প্রযোগ-যুগল নিষ্পাদনীয়।

চারী ও মহাচারী

শৃঙ্গারস্য প্রচরণাচ্চারী সম্পরিকীর্তিতা।
রৌদ্রপ্রচরণাচ্চাপি মহাচারীতি কীর্তিতা ।।

অন্বয়ল্যাখ্যা। যদ্যপি প্রচরণসাধারণ্যাৎ চারী ইত্যবগম্যতে তথাপি অত্র বৈশিষ্ট্যং দর্শয়তি যথা শৃঙ্গারস্য (শৃঙ্গারযোগ্য বেশালঙ্কাররূপতয়া তদ্বিভাবানুভাবসিদ্ধিহেতুকং সুকুমার প্রয়োগ বহুলং শৃঙ্গারতান্ডবং তস্য এব) প্রচরণাৎ (প্রকৃষ্টরূপেণ গতিপ্রয়োগঃ তৎ প্রয়োগবশাৎ) চারী (পাদস্য জঙ্ঘায়াঃ ঊর্বোঃ কট্যাশ্চ সমান করণাৎ চেষ্টা চারী ইতি) সম্পরিকীর্তিতা (নৃত্তনাট্য সংসৎসু প্রখ্যাতা)। তথৈবাপি রৌদ্রস্য (রৌদ্রবিভাবানুভাবসিদ্ধিহেতুকং চন্ডপ্রয়োগবহুলং রৌদ্রতান্ডবং তাদৃশস্য এব তান্ডবস্য) প্রচরণাৎ মহাচারী ইত্যেব কীর্তিতা নাট্য গান্ধর্বসংসৎসু ইতি বিশেষঃ। অত্র মহাশব্দেন শিবতান্ডবপ্রচরণং এব হি মুখ্যতঃ অভিসন্ধেয়ম্ ইতি।

বিশদার্থ। প্রচরণ-সাধারণ অর্থে চারী (১১ অঃ)। তাহলেও এস্থলে চারীবিশেষের প্রয়োগ সূচিত। শৃঙ্গারবিভাবক সুকুমারপ্রয়োগ-বহুল নৃত্তই শৃঙ্গারতান্ডব। শৃঙ্গারতান্ডবের

বিশিষ্ট প্রচরণই "চারী"। "চারী" ইতি পারিভাষিক-সাধারণ শব্দ দ্বারা পাদ-জঙ্ঘা-উরু-কটি-দেশের সমঞ্জস কর্ম উপদিষ্ট হয়েছে। গৌরবার্থে শৃঙ্গারপ্রচরণই চারী। কি হেতু? সর্ব নৃত্তনাট্য সংসদ্ ঐ অর্থেই 'চারী' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা পাকশাস্ত্রে 'অন্নপাক' শব্দ দ্বারা উত্তম তণ্ডুলাদি দ্বারা প্রস্তুত উত্তম অন্নই বুঝায়, অনুরূপভাবে নৃত্ত-নাট্য সম্প্রদায়ে "চারী" শব্দ দ্বারা পাদ-উরু-জঙ্ঘা-কটির শৃঙ্গারোচিত উত্তম প্রচরণই গ্রাহ্য হয়েছিল। প্রচরণ অর্থাৎ গতি প্রয়োগ। অনুরূপ ভাবে রৌদ্রবিভাবক ও উদ্ধতকর্মবহুল নৃত্তই রৌদ্রতাণ্ডব। রৌদ্রতাণ্ডবের উপযোগী প্রচরণ "মহাচারী" শব্দ দ্বারা গৃহীত। কি হেতু? রৌদ্রতাণ্ডবের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা পক্ষে মহাদেব (মহত্তম দেব) আচরিত নৃত্ত ও উপদেশই সর্বোত্তম। ইতি ভারতীয় নাট্য গান্ধর্ব সংসদের গুর্বাচার সিদ্ধি। অতএব—রৌদ্রচারীই মহাচারী; মহা অর্থে মহাদেব।

তাৎপর্য। পূর্বরঙ্গে রঙ্গদ্বার পর্ব সমাপ্ত হলেই চারী ও মহাচারী প্রযোগ নিদর্শিতব্য। অর্থাৎ সংকল্পিত নাট্যে যদি শৃঙ্গারতাণ্ডব ও রৌদ্রতাণ্ডব পরিবেশনীয় হয়, তবেই পূর্বরঙ্গে উক্ত প্রকার পাত্র-পাত্রীগণ পরীক্ষার্থে চারী প্রয়োগ করবেন। নচেৎ নয়। কার্যতঃ, ভরত মুনি উত্তম নাটকেরই আদর্শ নৃত্ত বুদ্ধ্যারূঢ় করেছেন। অন্নপাক ন্যায়ে। মহাদেব সম্বলিত উত্তম নাটকীয় আদর্শে নাট্য পরিকল্পিত হলে শিব-তাণ্ডবের মধ্যে চারী ও মহাচারীও থাকবে। যে সকল পাত্র-পাত্রী ঐ কার্যটি করবেন তাঁরাও পরীক্ষাপূর্বক মনোনীত হবেন। এই হল প্রধান উদ্দেশ্য।

অপর উদ্দেশ্য ও আছে। নৃত্তকর্মের অধিকন্তু অপর প্রকার কতিপয় কর্মেও চারী প্রযোজ্য। যথা —

চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্তং চারীভি শ্চেষ্টিতং তথা।
চারীভিঃ শস্ত্র মোক্ষণে চার্যা যুদ্ধে চ কীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ১১ অঃ।

অর্থাৎ নৃত্তপ্রস্তুতি পক্ষে, চেষ্টাসাধ্য (ব্যায়ামাদি) কর্মের পক্ষে, অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান-মোক্ষণ পক্ষে, এবং যুদ্ধ কর্ম পক্ষে চারীসকলই ন্যূনতম উপাদান। সরল ভাষায় চারী = পঁয়তারা (হিন্দীশব্দ)। যাই হক, চারী বিনা গতি নেই! কারণ, গতি = পাদ, উরু কটি ও জঙ্ঘার সম্মিলিত কর্ম।

কথা এই যে—নাট্যকর্মের বিশিষ্ট স্থানে নৃত্তাতিরিক্ত অপর পূর্বোক্ত কর্ম সকল ও নিদর্শনীয়। **অবশ্য, 'চারী' ব্যাপার আঙ্গিক-অভিনয়েরই অংশ।** কিন্তু, বাচিক অতিরিক্ত বিশিষ্ট অঙ্গ কর্ম ও প্রযোজ্য হতে পারে। যথা ব্যায়ামাদি কর্ম ইত্যাদি। এই সকল কর্মে যদি বিশিষ্ট "চারী" প্রয়োগ করণীয় হয়, তাহলে, পূর্বরঙ্গে বাচিক ও আঙ্গিক পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই চারী-প্রয়োগ পরীক্ষণীয়। এতদবসরে শৃঙ্গারচারী ও মহাচারী বিশেষও পরীক্ষণীয়।

এই পর্যায়ে পূর্বরঙ্গ কর্মবিভাগের দ্বিতীয় বিভাগ সমাপ্ত হল। তৃতীয় বিভাগীয় কর্মারম্ভ যথা —

ত্রিগত

বিদূষকঃ সূত্রধার স্তথা বৈ পারিপার্শ্বকঃ।
যত্র কুর্বান্তি সংজল্পং তত্রাপি ত্রিগতং স্মৃতম্ ।।

৩৫ অধ্যায়ে "পারিপার্শ্বিক" ও অত্র 'পারিপার্শ্বক' সকার্থবাচক পাঠান্তর এবং, যে পর্যায়ে বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বক নামধেয় সংসদ্‌সভ্যগণ মিলিত হয়ে সংকল্প করেন, সেই পর্যায়বিহিত কর্ম 'ত্রিগত' নামে আখ্যাত হয়।

সংজল্প অর্থ পরীক্ষিত বিষয়-বস্তু-কর্মের দোষ-গুণ লক্ষ্য করে তৎপরিহার বা প্রতিকারার্থে সম্যক্ জল্পনা করা। ত্রিগত অর্থাৎ ত্রয়ের আশ্রিত। এ স্থলে অর্থাৎ প্রথমবার পূর্বরঙ্গ

কর্মে (১) বিদূষকাদি ব্যক্তিত্রয় (২) পাত্র প্রয়োগ ও অর্থ (উদ্দেশ্য) ইতি ত্রয় এবং গীত, বাদিত্র ও নৃত্ত ইতিত্রয়ং। এই রূপে ত্রিগত। ত্রিগত সংজল্প ত্যাগ করলে পরীক্ষা-বিচার-নির্বাচন বলতে কিছুই থাকে না। পরীক্ষা-বিচার-নির্বাচন ত্যাগ করলে পূর্বরঙ্গের সার্থকতাই থাকে না। তখন, পূর্ববিহীন রঙ্গ হয় তামাশা বা ছেলে-খেলা (কিণ্ডার গার্টেন কলা)।

ত্রিগত ব্যাপারে গুণ অপেক্ষা দোষগুলিই সর্বথা লক্ষ্য। নচেৎ, গুণমুগ্ধতার কারণে দোষ অলক্ষ্য হলে, যাপ্য ব্যাধির উপসর্গের মতো পরে পরিণাম নাট্য কর্মের মধ্যে দোষগুলি আবির্ভূত হয়। এই উত্তম হেতুতেই বিদূষকের নাম সর্বাগ্রে পঠিত হয়েছে।

'বিদূষক' রূপে নির্বাচিত ব্যক্তি যে নাট্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী এ কথা বলাই বাহুল্য নচেৎ 'ত্রিগত' ব্যাপারে অন্য দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাঁকে স্থান দেওয়াই হত না। বিশিষ্ট রূপে দূষণ করেন ইতি বিদূষক। বিদূষক ব্যক্তি নিন্দাপ্রিয় নন। যেখানে যে দোষ লক্ষ্য হয়, তিনি সেই দোষেরই প্রসঙ্গ করেন। নাট্যগান্ধর্বের বিচার বিশেষজ্ঞ অপর বহু সংসদ্‌সভ্য উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু, বিদূষকের বৈশিষ্ট্য ও উল্লিখিত হয়েছে। ৩৫ অঃ ৫৭ শ্লোকে বিদূষক গুণ-লক্ষণ প্রসঙ্গের শেষে বলা হয়েছে "স বিধেয়ো বিদূষকঃ"। অর্থাৎ—'ত্রিগত' কর্মের নিষ্পত্তি নিমিত্ত বিদূষক ব্যক্তি বিধিপূর্বক * নির্বাচনীয়। এই হেতুতে "বিধেয়ঃ" বলা হয়েছে। নির্বাচনীয় ইতি স্বীকার করলেই যোগ্যতাসূচক গুণ ও জানা উচিত। সাধারণ গুণ'ত বুঝা গিয়েছে। অতঃপর, বিশেষগুণত সূচিত হয়েছে "বিদূষক" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ভাবে। অবশিষ্ট থাকে, কিছু লক্ষণ। বলা হয়েছে

বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজিহ্বো বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ ।।

অর্থাৎ জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ হওয়ার অতিরিক্ত ভাবে এ সকল লক্ষণের কোনও একটি লক্ষণ থাকলে তাদৃশ যোগ্যতা সাপেক্ষ বিদূষক নির্বাচিত হওয়া উচিত। যথা বামন, দন্তর (দীর্ঘ-দন্তী), কুব্জ, দ্বিজিহ্ব, বিকৃতমুখ খলতি (মস্তকে কেশলুপ্তি) ও পিঙ্গলাক্ষ (পিঙ্গলবর্ণের চক্ষু-তারকা) ইতি লক্ষণ থাকলে তাদৃশ যোগ্যতা সাপেক্ষ বিদূষক নির্বাচিত হওয়া উচিত। যথা বামন, দন্তুর (দীর্ঘদন্তী), কুব্জ, দ্বিজিহ্ব বিকৃতমুখ, খলতি (মস্তকে কেশলুপ্তি) ও পিঙ্গলাক্ষ (পিঙ্গলবর্ণের চক্ষু-তারকা) ইতি লক্ষণ সকল। লক্ষণ-তালিকা ভয়ানক সন্দেহ নেই।

প্রকারান্তরে বলা হল সৌম্যমূর্তি, নবীন যৌবন, নম্র-মধুর ভাব—ভাষণ* বিদূষকের অযোগ্যতাই সূচিত করে। বিদূষক মোহগ্রস্ত হলে চাকরি ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

বিদূষকপুরুষ পূর্বরঙ্গ-ত্রিগত কর্মকালে অগ্রাসনে স্থিত থাকেন; প্রেক্ষক-পরীক্ষক রূপে। এঁর উপস্থিতি মাত্রেই নট-নটীরা সাবধান ও সংযত হন। কারণ, বিদূষক ব্যক্তি কখন কার দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করবেন, এবং তার ফলাফলই বা কিরূপ হতে পারে, এ বিষয়ে শঙ্কাই অত্র গুণ। অধিক কি, স্বয়ং সূত্রধার বা পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট নট-নটীর প্রতি

---

*নাট্যশাস্ত্রের সব তাতেই বিধি! এও ত' জ্বালা কম নয়! এখনকার অবস্থা অবশ্য উন্নততর। শাস্ত্রও নেই, বিধিও নেই।

* যথা নট-নটী বিশেষের সাক্ষাৎ রূপ ও কর্ম দর্শনে "ভাল!" "বড়ো ভাল" "তোমার আঙ্গিকটা খু---ব ভাল লেগেছে!" "তুমি আমার বাড়ীতে এসো দেখি তোমাকে স্টার করা যায় কিনা, বুঝতেই ত' পারছ!" ইত্যাদি মুগ্ধভাষণ।

অন্যায় পক্ষপাতগ্রস্ত হলে, বিদূষক তাঁর পদাধিকার বলে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকেরও দোষ দেখিয়ে দেওয়ার সাহস রাখেন। ফল কথা, নট-নটীদের পক্ষে বিদূষক সাক্ষাৎ বিভীষিকা প্রতিপন্ন হলেও, নাট্যগান্ধর্বের সিদ্ধার্থে বিদূষকের বাক্য উত্তম সম্মার্জনী স্বরূপ।

প্রসঙ্গতঃ, নাটকাদি রচনার মধ্যে ভূমিকাধারী চরিত্রবিশেষ রূপ 'বিদূষক' ও এই ত্রিগত-জল্পনাকারী বিদূষক এক অভিন্ন লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি নন। অভিন্ন ব্যক্তি হলে ভূমিকাধারী বিদূষক কদাপি নিজ দোষ লক্ষ্য ও পরীক্ষা করতে পারে না।

এস্থলে **"দ্বিজিহ্ব"** ও **"পিঙ্গলাক্ষ"** সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। 'দ্বিজিহ্ব' বস্তুত সম্পর্কেই বুঝায়। এ স্থলে অর্থ হল সর্পবৎ ক্রূর। বিদূষক সাক্ষাতে হয়ত কোনও নট-নটীর প্রশংসা করেন। কিন্তু, ত্রিগত-সংজল্প কালে তাঁর অপর দূষক-জিহ্বাটি উদগ্র হয়ে উঠে। 'পিঙ্গল' ইতি বর্ণনাম নাট্যশাস্ত্রে বর্ণরচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত নয় (২৩ অঃ ৭৪ শ্লোক থেকে ৭৬ শ্লোক)। ভরত মতে "সিতনীল যোগে পাণ্ডুবর্ণ", "সিতরক্ত যোগে পদ্মবর্ণ,)" "পীতনীল যোগে হরিদ্বর্ণ" এবং "নীলরক্তযোগে কষায় বর্ণ" গ্রাহ্য হয়েছে। অপর সমস্ত ত্রিবর্ণ (প্রভৃতি) যোগদ্বারা লভ্য বর্ণ সকল "উপবর্ণ" বলা হয়েছে। সুতরাং 'পিঙ্গল' উপবর্ণ রূপে গণ্য। অথচ অমরকোষ ও অন্যান্য অভিধানে "নীলপীত মিশ্রবর্ণ পিঙ্গল" ইতি পঠিত। নীলপীত মিশ্রণে হরিদ্ বর্ণ (সবুজ রং) লোক প্রসিদ্ধ। নাট্যশাস্ত্রেও অনুরূপ বর্ণনা গ্রাহ্য হয়েছে। সুতরাং, "নীলপীত মিশ্র বর্ণই পিঙ্গলবর্ণ" ইতি সিদ্ধান্ত গ্রাহ করি না। বরং মনে হয়, নীল ও পীতের সঙ্গে অপর অজ্ঞাত একটি বর্ণ যোগে পিঙ্গলবর্ণ"। প্রচলিত বাংলা ভাষায় "কটা চোখ" নির্ভরযোগ্য বা সুস্থির বিবৃতি নয়। তবে, নীল-পীত ও সিত বর্ণ যোগে এক প্রকার "কটা চোখ" সাধ্য এও প্রত্যক্ষ।

সূত্রধার। যিনি পূর্বরঙ্গ ও নাট্যগান্ধর্ব কর্মের বিষয়-বস্তু সিদ্ধির নিমিত্ত গুর্বাচার সিদ্ধ সূত্র বাক্য ধারণ করে উক্ত বিষয়াদির মান-প্রমাণলক্ষণ নির্ণয় করেন এবং উত্তম প্রযোগ সাধিত করেন, সেই 'পুণ্যাভিধান' (পবিত্রনামা) ব্যক্তিই সূত্রধার ইতি ভারতীয় নাট্যগান্ধর্ব সম্প্রদায়গত নিরুক্ত। ৩৫ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোক থেকে ৫২ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 'সূত্রধার' ও 'আচার্য' নামধেয় পুরুষদ্বয়ের স্বাভাবিক ও সাংস্কারিক গুণ সকলের সাধারণ্য বর্ণিত হয়েছে। সামান্যতঃ পাঠ করলে মনে হয় যেন সূত্রধার ও আচার্যের গুণলক্ষণে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু, উক্ত পদ্যস্তরের অব্যহিত পূর্বস্থ দুটি গদ্যবাক্য সূত্রধারের বিশিষ্ট গুণ লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। যথা—"**তত্র সূত্রধার গুণান বক্ষ্যামঃ। পুণ্যাভিধানম্বেব তল্লক্ষণং অভিমতবাক্‌সংস্কারাঃ তালবিধানজ্ঞতা স্বর বাদিত্রত্ত্ববেদনঞ্চ ॥**" আচার্যের পক্ষে এই গুণলক্ষণসমবায় উপদিষ্ট হয়নি।

উক্ত গদ্যবাক্যের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা। প্রযোক্তৃলক্ষণপ্রসঙ্গেষু আদৌ সূত্রধার ইতি নাম পুরুষস্য গুণান্ কথয়তি। বহুপূর্বাচার্যবাক্যানুবাদতয়া অত্র বক্ষ্যামঃ ইতি শব্দস্য বহুবচন প্রয়োগঃ সার্থকঃ ইতি। কথমাদৌ সূত্রধারগুণপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ প্রযোক্তৃষু তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বাদ্। কিম্ভূতং তৎ শ্রেষ্ঠত্বং চেৎ তথাহ পুণ্যাভিধানমিত্যাপি। যস্য নামগ্রহণমাত্রেণ সর্বাপরপ্রযোক্তৃণাং জিহ্বাশুদ্ধি র্ভবতি শ্রদ্ধাবিশ্বাসৌ চ উপজায়েতে বৃত্তিলাভাদি বা ভবতি স এব পুণ্যাভিধানঃ পবিত্রনামা সূত্রধারঃ ইতি। সর্বনাট্য গান্ধর্ব কর্মণাং প্রমাণসূত্রাণি উদ্ধারয়তি সর্বপ্রয়োগং চ সাধয়তি ইতি সূত্রধারশব্দস্য নিরুক্তি ঃ প্রাচীননাট্যগান্ধর্বসম্প্রদায়সমাচারঃ ইতি এব অবগম্যতে। অত্র নামখ্যাতিরেব সূত্রধারস্য মুখ্যলক্ষণম্। ননু কিমস্য কর্মলক্ষণং বা ইতি চেৎ তদাহ অভিমত বাক্‌সংস্কারাঃ ইত্যাদি। দীক্ষা-শিক্ষাগুর্বাচারশৌচাদিসাধনেন এব নিরন্তরং যস্য বাক্য প্রয়োগসামর্থ্যং দেশকালপাত্রাভিমতাঃ সংস্কারাঃ গুণাঃ ইত্যেব বর্তন্তে অত্র তাদৃশাঃ

সংস্কারাঃ হি প্রথমং লক্ষণম্। দ্বিতীয়ং চ তালবিধানজ্ঞতা নাট্যগান্ধর্বকর্মসু মাত্রাকলালয়ানাং প্রয়োগবিধানং তালবিধানম্ তদ্‌বিধানবিশেষজ্ঞতা ইতি। তৃতীয়মপি স্বরবাদিত্রতত্ত্ব বেদনঞ্চ অত্র স্বরঃ ষড়্জাদীনাং যঃ এব স্বরঃ বাদিসংবাদ্যনুবাদিরূপেণ রাগরসভাবাদেঃ কারণম্ এব ভবতি সঃ এবাত্র স্বরশব্দেন গৃহ্যতে। বাদিত্রমত্র বীণাদিসর্বাতোদ্যমিলিতপ্রযোগবিধানম্ ইতি। তয়োঃ স্বরবাদিত্রয়োঃ মূলীভূতং তত্ত্বং রসভাবাভিনয়ধর্মবৃত্তিপ্রবৃত্তি বিবেক বিশেষং যদ্ এব নাট্য গান্ধর্বয়োঃ যোগসাধকং ভবতি তদ্ এব তত্ত্বম্ ইতি। তাদৃশস্য এব তত্ত্বস্য বেদনং জ্ঞাপন-বৈশারদ্যম্ ইতি লক্ষণানাং সমাহারেণ তল্লক্ষণং সূত্রধারপুরুষস্য লক্ষণম্ ইত্যেব অবগন্তব্যম্।

অর্থ। বহু প্রযোক্তৃগণের লক্ষণপ্রসঙ্গ। পরে আচার্যগুণ প্রসঙ্গ। সূত্রধারের শ্রেষ্ঠত্ব কি হেতু? উত্তরে বলা হয়েছে, সূত্রধার পুণ্যনামা ব্যক্তি। অপর সর্বপ্রযোক্তৃগণ যাঁর নাম উচ্চারণ ক'রে জিহ্বাশুদ্ধি করেন* (বাক্‌পবিত্রতা লাভার্থে,) হৃদয়ে শ্রদ্ধাবিশ্বাস সঞ্চয় করেন, অপি চ বৃত্তিলাভাদিও কামনা করেন, সূত্রধারই সেই পুণ্যনামা পুরুষ। নাম খ্যাতিই এ'র মুখ্য লক্ষণ। সর্বপ্রয়োগশিল্পীদের কর্মসূত্রগুলি ইনি ধারণ করেন, এই অর্থেও ত' সূত্রধার নাম সিদ্ধি। সূত্রধারের কর্মলক্ষণই বা কিরূপ? উত্তরে বলা হয়েছে "অভিমত বাক্‌সংস্কারঃ" ইত্যাদি কর্মলক্ষণ। দীক্ষাশিক্ষাপুরস্কৃত গুর্বাচার শৌচাদি নিরন্তর সাধনের (৩৬ অঃ ১৩ শ্লোক) ফলে সূত্রধারের বাক্যোপদেশ প্রয়োগ করার ক্ষমতা নিত্যই দেশকালপাত্রাভিমত সংস্কার রূপে অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। তিনি যখন বিদূষক পারিপার্শিবক আচার্য প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করেন, তখন তিনি যেরূপ অভিমত বাক্য প্রয়োগ করেন, পুনশ্চ, গণিকা উদ্‌ভটা প্রভৃতি প্রকৃতিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ কালেও সে রূপ ক্ষেত্রাভিমত বাক্য প্রয়োগ করেন। পুনশ্চ, নাট্যে প্রযোজ্য সংলাপ-গান কর্মে সংস্কৃত, বহুপ্রকার অপভ্রংশ ও দেশভাষার সুষ্ঠ উচ্চারণাদি একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে পাত্র-পাত্রীগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদান, পক্ষে সূত্রধারই প্রধানতম ব্যক্তি। দ্বিতীয় কর্মলক্ষণ যথা 'তালবিধানজ্ঞতা'। গান্ধর্ব ও নাট্যের নির্দোষ ও সমুচিত সহযোগ ব্যতীত প্রয়োগ-সাফল্যের আশা নেই। গীতাদি বস্তুর উৎকৃষ্ট রচনা ও পরিকল্পনা মূলে প্রামাণুগ মাত্রা-কলা-লয়ের অধীন। অপর বহু প্রয়োগ শিল্পীর তালজ্ঞান প্রয়োজন হ'লে ও **তাল বিধানজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না** (৩২ অঃ ৪৫৯/শ্লোক থেকে ৪৬৪ শ্লোক, গাতৃবাদকগুণপ্রসঙ্গ)। কিন্তু, সূত্রধার নাট্য গান্ধর্ব পরিকল্পনার সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই হেতুতে তিনি তাল বিধানজ্ঞ ব্যক্তি। তৃতীয় লক্ষণ হ'ল স্বরবাদিত্রতত্ত্ববেদন। স্বরবাদিত্রবিষয়ক তত্ত্ব অন্যকে জ্ঞাপিত করার যোগ্য বিশারদতা। স্বর অর্থে এ স্থলে ষড়্জাদি স্বর সকলের যে স্বর বিন্যাসগোচর হ'য়ে বাদিসংবাদী ইত্যাদি রূপে রাগরসভাবাদির কারণ হয় সেই স্বর বৈশিষ্ট। বাদিত্র অর্থে বীণাদি সর্ব আতোদ্যের (বাদনীয় যন্ত্রের) সম্মিলিত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ। উক্ত স্বর ও বাদিত্র ঘটিত ব্যাপার সকলের তত্ত্ব অর্থাৎ রসভাবাভিনয়াদি ব্যাপার সকলের সহিত যোগসাধন বিষয়ে বিবেক। সূত্রধার পুরুষ এই বিবেক বা তত্ত্ব জ্ঞাপনে বিশারদ। এই রূপে সূত্রধার-লক্ষণ স্পষ্টীকৃত হ'ল।

পরে, (৩৫ অঃ ৪৫ শ্লোক থেকে ৫২ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) সূত্রধার ও আচার্যের স্বাভাবিক ও শিক্ষা সংস্কারজ গুণ সকল উল্লিখিত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে **সূত্রধার পুরুষের পক্ষে পূর্বোক্ত 'তিন-লক্ষণ' যুক্ত প্রসিদ্ধ হ'ল ন্যূনতম**; আচার্যের পক্ষে নয়। অতঃপর,-সামর্থ্য

---

*[এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়! আধুনিক সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীরা কি প্রাতঃশয্যায় বেড্-টি পানের সময়ে চেতনাবচেতন মুহূর্তে তাঁদের পরম উপকারী ম্যানেজারের চরিত্র স্মরণ করে না! শিল্পীরা কখনও অকৃতজ্ঞ নয়।]

বিষয়ে প্রত্যেক আচার্য ও প্রত্যেক সূত্রধারের সমগ্র গুণ-সংহতি সম্ভব নয়। কিন্তু, সূত্রধার ও আচার্য পক্ষে সম্মিলিত ভাবে সর্বগুণসমবায় কাম্য ও সম্ভব।

প্রশ্ন। 'সূত্রধার' নির্বাচিত হ'ন কি রূপে, এবং কে বা কারা সূত্রধারকে নির্বাচিত করে? উত্তর। **'সংসদ্'ই সূত্রধারকে নির্বাচিত করে।** 'সংসদ্ শব্দটি ২৭ অঃ ৫৬ চিহ্নিত শ্লোকে পঠিত। কোনও বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও নির্বাহ উদ্দেশ্যে "সমক্ Ɩ রূপে আসন পরিগ্রহ" ইতি সংসদ্। সংসদের শাখা সমিতি বা সাব্‌কমিটি হ'ল উপনিষদ। তদানীন্তন সংসদ্ কেমন করে গড়ে উঠেছিল, সংসদের সভ্য বলতে কোন্ কোন্ প্রকার গুণান্বিত ব্যক্তি বুঝাত, সভ্যগণের শ্রেণী ভেদে উপাধি-ভেদ, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 'নাট্যশাস্ত্র' নামে গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। এ স্থলে প্রসঙ্গ-বিস্তার করা যাবে না। তবে, এই মাত্র বলা যায় যে সংসদ্ গঠন করা ও গম্যমান করার উপযোগী বুদ্ধি ভরতের কালে ভারতীয় সংস্‌দ সভ্যদের ছিল। নচেৎ উক্ত বিষয়গুলি নাট্যশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির মধ্যে লভ্য হ'ত না। জ্বলদ্-জীবন্ত 'পূর্বরঙ্গ' শব্দটি 'রিহার্শ্যাল্' সূচিত করে,। এই অনুসন্ধানই যে কালে লোপ পেয়েছে সে কালে "সংসদ্" "উপনিষদ" শব্দ দ্বয়ের অর্থাদির অনুসন্ধান পক্ষে 'কা কথা'!

পারিপার্শ্বক (পারিপার্শ্বিক)

ত্রিগত সংজল্পের তৃতীয় পুরুষ এই পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির গুণ সম্বন্ধে ৩৫ অঃ ৫৩ শ্লোকে বলা হয়েছে—

সূত্রধারগুণৈশ্চৈব কিঞ্চিদূনৈঃ সমন্বিতঃ।
মধ্যমপ্রকৃতিতজ্‌জ্ঞৈ র্বিজ্ঞেয়ঃ পারিপার্শ্বিকঃ॥

অর্থাৎ। সূত্রধার ও আচার্যের পরিপার্শ্ব দেশে (নিকট চতুর্দিকে) আসন গ্রহণ করার যোগ্য ইতি পারিপার্শ্বিক। কিরূপ গুণ থাকলে যোগ্যতা হয়? বলা হয়েছে, সূত্রধারের গুণ সকল দ্বারা সমন্বিত, অথবা, তদপেক্ষা কিঞ্চিদ্ অল্পতর সংখ্যক গুণ সকল দ্বারা সমন্বিত হলে এবং মধ্যম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হ'লে তাদৃশ্য যোগ্যতার বলে পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি তদ্রূপে নির্বাচিত হ'ন কে নির্বাচন করেন? উত্তরে বলা হয়েছে"তজ্‌জ্ঞৈঃ" অর্থাৎ তত্তদ্‌বিশেষজ্ঞ গণের ন্যূনতঃ তিন জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পারিপার্শ্বিক ব্যক্তির যোগত্যা-অযোগ্যতা বিচারিত হবে। "তৎ" অর্থে এ স্থলে 'ষড়ঙ্গনাট্য'। নাট্যের ষড়ঙ্গ যথা রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। "তজ্জ্ঞঃ" অর্থ ষড়ঙ্গ নাট্য-তত্ত্ব যিনি জানেন বুঝেন। "তজ্‌জ্ঞৈঃ" ইতি বহুবচনের তাৎপর্য এই যে কোনও এক জন মাত্র সংসদ্ সভ্য মিলিত ভাবে "তজ্ঞঃ" (বা "তজ্জ্ঞাঃ) হতে পারেন। এই প্রকার তিন জন বিশেষজ্ঞ 'পারিপার্শ্বিক' পদে নির্বাচিত মনোনীত করেন। এ রকম 'তজ্ঞ' ব্যক্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে প্রেক্ষকসকল ষড়ঙ্গনাট্যকুশল (২৭ অঃ ৫১ শ্লোক "ষড়ঙ্গনাট্যকুশলাঃ" প্রেক্ষকাঃ ইতি)। এ স্থলে ও, বহুবচন শব্দের তাৎপর্য এই যে **"প্রেক্ষক" নামে বিশিষ্ট পুরুষের** বহু লক্ষণ বা সমস্ত লক্ষণ এক জন মাত্র প্রেক্ষকে না'ও দৃষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু, বহু প্রেক্ষকের সম্মিলিত বিচক্ষণতা পরীক্ষা-বিচার কার্যকে সম্যক ভাবে নিষ্পাদিত করে।

অতএব—পূর্বরঙ্গ কর্মে রঙ্গদ্বার, চারী মহাচারী পর্যন্ত কার্যসকলের নিরীক্ষণ পরীক্ষা ও বিচার পক্ষে, এবং প্রথমবার অনুষ্ঠান পক্ষে ত্রিগত-সংজল্পের বিধি উপদিষ্ট হয়েছে। এবং যোগ্য পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি 'ত্রিগত' প্রয়োগের মধ্যে অন্যতম কার্যনির্বাহক।

প্রসঙ্গত, **মধ্যমপ্রকৃতির অর্থ** তাৎপর্য উদ্ধারণীয়। প্রকৃতি জাতিগত রূপে ত্রিবিধ যথা—সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাধান্য ইতি উত্তমা প্রকৃতি; সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রাধান্য ইতি মধ্যমা প্রকৃতি; এবং রজঃ ও তমোগুণের প্রধান্য ইতি অধমা প্রকৃতি। জ্ঞান ও কর্মবিচক্ষণতা ইতি সত্ত্বরজঃ প্রাধান্যের লক্ষণ। জ্ঞানের সঙ্গে দৈহিক অকুশলতা সঙ্গে কর্মে আলস্য ইতি রজস্তমঃ প্রাধান্যের লক্ষণ (২৭ অঃ ৫৭ শ্লোকে সংসদ্‌স্থ সভ্যগণের উত্তমমধ্যমাধমভেদ)। অত্র 'পরিপার্শ্বিক' ব্যক্তির নির্বাচন পক্ষে মধ্যমাপ্রকৃতির লক্ষণই যথেষ্ট।*

'পারিপার্শ্বিক' ব্যক্তিক লক্ষণবর্ণনার অবকাশে 'মধ্যমপ্রকৃতি' সূচিত করার তাৎপর্য এই যে, ইতঃপূর্বে বর্ণিত (৩৫ অঃ) সূত্রধার ও আচার্য উত্তমপ্রকৃতিমান হবেন, এবং পারিপার্শ্বিকের পরে প্রসঙ্গভূত সমুদায় প্রযোক্তৃগণ অধমপ্রকৃতিমান হবেন। অল্পে ও প্রকারান্তরে সমস্ত প্রকৃতির কথাই বলা হয়ে গেল।

পুনশ্চ, 'মধ্যমা প্রকৃতি' শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পারিপার্শ্বিক ইতি উপাধি হ'ল কর্মদায়িত্বসূচক, এবং ত্রিগত সংজল্প ব্যাপারে 'লোকোপচারচতুরা' 'শিল্পশাস্ত্র বিশারদা' ও 'বিজ্ঞানমাধুর্যযুতা' (৩৪ অধ্যায়, প্রকৃতি বিচার, ৪-৫ শ্লোক) স্ত্রীলোক ও পারিপার্শ্বিক দায়িত্বে আহূত হ'তে পারেন। এই স্ত্রীলোক ও মধ্যমপ্রকৃতি সম্পন্না। নৃত্ত কর্মের সূক্ষ্ম বিচারে এ প্রকার গুণবতী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ছিল। বিশেষত্বঃ ৩৪ অঃ নাটকীয়া নর্তকী ওসর্বগুণসম্পন্না নর্তকীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে (তথা বলা হয়েছে "ন দৃশ্যতে গুণৈস্তুল্যা যস্যাঃ সা এব নর্তকী), তা থেকে অনুমান করা যায় নৃত্তোপযোগী বয়স অতিক্রান্ত হ'লে, এঁরাও পারি-পার্শ্বিক রূপে আহূত হ'তেন।

প্রথমবার পূর্বরঙ্গের ত্রিগত সংজল্প শেষ হ'লে প্ররোচনা নামে শেষ পর্ব অনুষ্ঠেয়।

উপক্ষেপেণ কাব্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া।
সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা॥

অন্বয়ার্থ। কাব্যস্য (অত্র নাট্যমূলীভূতস্য এব কাব্যেতিবৃত্তস্য কাব্যবন্ধস্য বা ন তু রসাস্বাদ কারকস্য এব কাব্যস্য ইতি) উপক্ষেপেণ (দৃষ্টান্তদেঃ উল্লেখঃ উপক্ষেপ তদুপক্ষেপ সহকারেণ) যা যদ্‌বিধা আমন্ত্রণা (দ্বিতীয়াদিবারক্রমেণ সাধস্য পূর্বরঙ্গস্য পূর্বকল্পনা এব ইতি) হেতু-যুক্তিসমাশ্রয়া (হতুযুক্তি সংস্থাপিতা এব) তু সিদ্ধেন (বিশেষেণ কর্মসিদ্ধপ্রয়োগিনা) প্রযুজ্যতে, সা (তাদৃশী আমন্ত্রণা) প্ররোচনা ইতি পারিভাষিকশব্দেন বিজ্ঞেয়া গ্রাহ্যা ইতি। দ্বিতীয়া-দিবারারব্ধেষু চ পূর্বকর্মসু সর্বপ্রয়োগিপক্ষে প্রকৃষ্টরূপেণ রুচিসম্পাদং ভবেৎ। যথা ভোজ্যসেবন-ব্যাপারে মধুরাম্লাদিরস্যং লেহ্যম্ অপি প্রজোজ্যং তদ্‌বৎ বিধিদৃষ্টয়া এব আমন্ত্রণয়া প্রয়োগিনাং স্ব স্ব কর্মসু রুচিবর্দ্ধনং ভবতি ইতি শেষঃ।

অর্থ ও আৎপর্য। প্রথম বার পূর্বরঙ্গ কর্মে প্রয়োগিগণ মহাচারী ও গীতাবাদ্যনৃত্ত সম্পাদিত করেছেন, এবং ত্রিগত সংজল্প মুখে উত্তম শিল্পীরাও নিবাচিত হয়েছেন। কিন্তু, সংকল্পিত নাট্যের সমগ্র পরীক্ষাদি এখন ও অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয়াদি বারেও প্রকারান্তরে পূর্বরঙ্গ কর্ম সকলের অনুষ্ঠান বিধেয় সন্দেহ নেই। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বনিষ্পাদিত কর্মসকল ও অনুষ্ঠেয়। যথা দ্বিতীয় বারেও আঙ্গিক-বাচিক সমেত আহার্য অভিনয় প্রযোগ; চারী-মহাচারী সহিত নৃত্তাদির প্রয়োগ ইত্যাদি। সুতরাং, এ বিষয়ে প্রযোগিবৃন্দের অভিনব ও প্রকৃষ্ট রুচি সম্পাদনও কর্তব্য। নতুবা, বারান্তর সাধ্য ও প্রকারান্তর-সাধ্য একই কর্মে আদিষ্ট হ'লে তাঁরা আপত্তি করতে পারেন, যথা "ও 'ত' আগেই হয়ে গিয়েছে। আবার কেন?"

---

*[সংসদ্ লোপ পেয়েছে, অথচ কতিপয় উপনিষদ্ জীবন-ধারণ করে আছে, এ প্রকার ঘটনা প্রাচীন ভারতে একাধিকবার ঘটেছিল সন্দেহ নেই। আধুনিক কালে সম্প্রতি একটি নাট্য গান্ধর্ব সংসদ ও তদাশ্রিত উপনিষদ্ পক্ষে এ রকম ঘটনা হওয়ার উপক্রম ঘটেছে।]

প্ররোচনা বিধির তাৎপর্য। প্ররোচনা"যেন তেন বিধেয়" ব্যাপার নয়। প্ররোচক পুরুষ স্বয়ং নাট্যাদিপ্রয়োগে সিদ্ধ; যথা সূত্রধার। মাত্র তিনিই প্ররোচনা করবেন। অন্ততঃ, প্রথমবারে অনুষ্ঠেয় পূর্বরঙ্গের শেষে।

অধিকন্তু, কাব্যাংশ্রিত ইতিবৃত্তের উপক্ষেপ, এবং হেতুযুক্তিপূর্বক আমন্তণ বাক্যাদিও প্রয়োজন। সংকল্পিত নাট্যের সমস্ত ঘটনাই যে শিল্পীরা জানেন বা বুঝেন এমন নিশ্চয়তা নেই। অতএব সেই ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোনও কোনও প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে, শিল্পী ব্যক্তিদের প্ররোচিত করা উচিত।

একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটক অবলম্বনে সংকল্পিত উৎকৃষ্ট নাট্যের প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছে। এবং দু'জন ভূমিকাধারিণী এই পর্বে পরীক্ষোত্তীর্ণা হয়েছেন। দ্বিতীয় পূর্বরঙ্গে আঙ্গিকবাচিকের অধিকন্তু সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়ের পরীক্ষা এঁরা দেবেন। সাত্ত্বিক ভাবের অভিনয়ই কঠিনতম। **কারণ, ভূমিকাধারী নট বা নটী এককালীন অভিনয়ে** নিজ সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে, ভূমিকার সত্ত্বার মধ্যে অবগাঢ় না হ'লে সত্ত্বাভিনয় যোগ্য ভাব সমুদিত হ'তে পারে না। উৎকৃষ্ট সত্ত্বাভিনয় হ'লে তত্তাবং কালে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় (মূর্চ্ছিত হয়ে লীন হওয়া) এই আটটি বিভাবের কোনও না কোনও দু'টি তাদের দেহে প্রকাশ পায়। **তদ্ভাবাবিভাবিতসত্ত্বাই* সাত্ত্বিক ভাবের উৎস স্বরূপ।**

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে শকুন্তলা ভূমিকা ধারিণী ঐ দুজন অভিনেত্রী আদ্যোপান্ত শকুন্তলার সত্ত্বা তাঁর ও বিশিষ্ট রূপে হৃদয়স্থ না করলে, অঙ্কের যে যে স্থানে সত্ত্বাভিনয়ের পরাকাষ্ঠা রূপে কোনও সাত্ত্বিকভাবে যুগলের অভিব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই সেই স্থানে সেই বাঞ্ছিত প্রকাশ ঘটবে না। যথা, গর্ভবতী বিরহিনী শকুন্তলা অনন্য চিত্তে দুষ্মন্তের স্মরণে বহির্জগত বিস্মৃত হয়ে আসীনা। সামান্য-অভিনয় (২৪ অঃ) দ্বারা উক্ত অবস্থা 'অভিলাষ' 'চিন্তা' 'অনুস্মৃতি' 'প্রমাদ' ও "জড়তা" ইতি ভাবগুলি ব্যক্ত করা কঠিন নয়; যদিও এতৎ সমস্তই শিক্ষা-শিক্ষণ সাপেক্ষ। কিন্তু, 'অনুস্মৃতি' ইতি সামান্যতঃ ভাবোদয়ের মধ্যে রোমাঞ্চ ও অশ্রুবিন্দুর উচ্ছ্বাস ও উদ্‌গম কিপ্রকারে ঘটান যায়। উক্ত নটীদ্বয় যদি পূর্বে ব্যক্তিগত ঘটনা পক্ষে শকুন্তলার তদবস্থা ভোগ করে থাকেন, তা হ'লে হয়ত' হ'তে পারে। কিন্তু ঐ প্রকার ভাগ্য ত' আশা করা যায় না। কিন্তু, যদি উপযুক্ত রূপে দৃষ্টান্ত বর্ণনা ব্যাখ্যাদি পূর্বক শকুন্তলার তদবস্থা সত্ত্বাকে ঐ নটীদ্বয়ের* হৃদয়ে সঞ্চারিত করা যায়, তা হলে যথামুহূর্তে বাঞ্ছিত ফল লাভের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, চরম মুহূর্তে চোখ থেকে দু'পাঁচ ফোঁটা জল বার হ'তে পারে; রোমাঞ্চ বা বেপথুও অভিব্যক্ত হ'তে পারে।

এই হ'ল উপক্ষেপের, অর্থাৎ সেই সংকল্পিত নাট্যের বা কাব্যের অধিকৃত ঘটনা-ব্যাপারাদির দৃষ্টান্ত-বর্ণনা-ব্যাখ্যা দ্বারা নট-নটীদের প্ররোচনা কার্যের মূল কথা। অবশ্য যিনি অনুভবসিদ্ধ,

*[সাত্ত্বিক ভাবাভিনয়ের সঙ্গে সত্ত্ব বা সাত্ত্বিক নামে গুণের কোনও সম্বন্ধ নেই। শব্দরূপের অভিন্নতাবশতঃ সত্ত্বাভিনয়ের সঙ্গে সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ ইতি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছিল।]

* যাঁরা মনে করেন নটীদের অনুভবপ্রবণতা নেই, এবং মর্ম্ম কবিও কুলবধূগণের হৃদয়েই অনুভবপ্রবণতা আছে, তাঁরা মনুষ্যচরিত্রের কিছুই জানেন না। অভিনয়-মুহূর্তে নট-নটীরা সত্ত্বাভিনয়ের চরম দৃশ্য প্রকটিত করতে পারেন বলেই সামাজিক ভীষ্ম-সাবিত্রীগণ অভিনয় দর্শন করতে লালায়িত হন,—ইতি সর্বজনবিদিত ঘটনা উক্ত মতবাদীদের মন্তব্যকে খণ্ডিত করে।

রসিক ও কর্মজ্ঞানিষ্ঠ প্রযোক্তা তিনিই এই কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়ারি বারে অনুষ্ঠেয় পূর্বরঙ্গে আঙ্গিক-বাচিকের অধিকন্তু সাত্ত্বিক-আহার্যের অভিনয়ের মনঃপ্রস্তুতি পক্ষে নট-নটীদের হৃদয়ে প্ররোচনা সৃষ্টি করা, ইতি নাট্যশাস্ত্রীয় প্ররোচনা।

অতঃপর, উক্ত প্ররোচনার অবসরে হেতু-যুক্তি প্রয়োগেরও আবশ্যক ঘটে। সর্ব নট-নটীই মূর্খ বা অশিক্ষিত নয়। তা ছাড়া, সাধারণ জীবনেও সংশয় ঘটলে মানুষ যথাসামর্থ হেতু-যুক্তি প্রয়োগ করে এবং পরামর্শ ব্যাপারটিই হেতুযুক্তির সমাশ্রিত। পূর্বরঙ্গ প্ররোচনা পক্ষে বিশেষ কথা এই যে—তিনি সিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বিদ্যাসিদ্ধ। কেমন করে, কোথায়, কিরূপে শ্রোতার হৃদয়গ্রাহিতার পক্ষে কিরূপ দৃষ্টান্ত ও হেতুযুক্তি প্রয়োগ কার্যকরী হয়, এ সমস্ত তিনি জানেন। তিনি গুরুবাক্য কান্তাবাক্য ও বন্ধুবাক্য এই তিন বাক্যের সামর্থ্য ও ফলসাধকত্ব জানেন।

আধুনিক আমরা ভরতের যুগের মধ্যে ফিরে যাই, এরকম চিন্তা আমার মনে আদৌ উদিত হয় না। কিন্তু, ভরতের কালে ও তৎপূর্ব কাল থেকে আগত রূপে নাট্য-গান্ধর্ব প্রযোগ বিষয়ে, এবং বিশেষ করে, পূর্বরঙ্গ বিষয়ে ব্যষ্টি-সমষ্টিগত ভাবনা ও প্রযোগবৃদ্ধি ছিল। সেই ভাবনা ও বুদ্ধির সর্বোত্তম ও মার্জিত রূপ নাট্যশাস্ত্র থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব। অনুশীলন করলে সেই ভাবনা-বুদ্ধির অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম উদার ও বাস্তব মননশীলতা আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। এই **মননশীলতা** আমার মতো সামান্য বিদ্যার্থীকে তুলনামূলক চিন্তা করতে বাধ্য করে। আধুনিক যুগে নাট্যগান্ধর্ব প্রযোজনার অন্তর্নিহিত মননশীলতা নামে যা দেখছি, সেটা হ'ল **জননশীলতা** মাত্র। বেদব্যাস ও বাল্মীকিবৃন্দের মধ্যে যে পার্থক্য, নাট্যশাস্ত্রীয় মননশীলতা ও আধুনিক মননশীলতার মধ্যে সেই পার্থক্য। অবশ্য, পরিকল্পনা-প্রযোজনার মননশীলতার কথাই বলছি। কিন্তু ব্যবহারিক উৎকর্ষ ও প্রয়োগচাতুর্য বিষয়ে আধুনিক নট-নটী গন্ধর্ব-গান্ধর্বিকার দল যে আগ্রহ, অধ্যবসায় ও কুশলতার দৃষ্টান্ত উপাস্থাপিত করছেন তার তুলনা সংগ্রহ করা কঠিন। এতৎ সত্ত্বেও যে "বইটা মার খেয়ে গেল" ইতি সত্যভাষণ শুনছি, সেই "মার খাওয়ার" মূলে শিল্পী ব্যক্তিদের দোষ খুঁজে পাইনে। মূলে আছে, উক্ত "বই" নামে বস্তুটির রচনায় জননদোষ, এবং পূর্বরঙ্গ কর্মসাধনে প্রযোজক বৃন্দের অজ্ঞতা, অবহেলা ও আলস্য।

'পূর্বরঙ্গ' শব্দটি আপন ঘরের নিধি। "রিহার্শ্যাল" শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অপরিসীম আত্মবিস্মৃতি লুকিয়ে আছে। এই ইংরাজী শব্দটির জ্ঞান বা ব্যবহার ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু "পূর্বরঙ্গ" শব্দটির সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অতীব মর্মান্তিক ও লজ্জাকর। কায়মনোবাক্যের পক্ষে যেটা লজ্জাকর ও অশোভন পরমুখাপেক্ষিতা সেই দোষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছি।

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

যন্ত্রমুখর আধুনিক সভ্যতার শেষপর্বে আজ পৌঁছিয়েছি। মহাসংকটের কালো ছায়ায় ছেয়ে গেছে দিগন্তল। সমস্যা বিজড়িত জীবন, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষের চোখ রাঙানি, নিত্য বয়ে চলেছে অশান্তির ঝোড়ো হাওয়া। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা সমস্যার ভারে পীড়িত মানবাত্মা, প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ। অতীত বিস্মরণের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত চির অনিশ্চিত ভবিষ্যত, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের তরঙ্গে দুলছে বর্তমানের প্রহরগুলো। "হোয়ার ইজ সায়েন্স গোয়িং" কথিত পুস্তকে বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলছেন "ইতিহাসের এক গুরুত্ব পূর্ণ মুহূর্তে আমরা জীবন ধারণ করছি। সঙ্কট বলতে যা বোঝায় সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি। সভ্যতার ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক—সর্ব বিভাগে আমরা সঙ্কটপূর্ণ বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখে এসে পৌঁছেছি জনসাধারণের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের ধারা শুধুমাত্র লক্ষণীয় নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মৌলিক ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির এক বিপুল আলোড়ন এসেছে। এই লক্ষণগুলি বহুলোকের নিকট নবযুগের প্রারম্ভ সূচীত করছে, আবার, কিছু লোক আছেন যাদের কাছে এই সঙ্কট সভ্যতার চরম পরিণতি ধ্বংশের অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে।"

দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুধা মেটানো, দৈহিক প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অন্য কিছু ভাববার তাগিদ আজ আমাদের নেই। অঙ্কমত্ততার ঝোঁকে আমরা সর্বদা ভেসে চলেছি। কোথাও এক মুহূর্ত স্থির রয়ে চিন্তা করবার অবসর নেই। হাল্কা ভাবাবেগ, অস্থির জীবনযাত্রা, সঙ্গতিহীন চিন্তারাশি আমাদের অন্ধকার থেকে গভীরতম অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবন বিকৃত, মন খণ্ডিত, এক ছন্দহীন বেসুরো জীবনের ভার বহন করে চলেছি। জীবন ধারণ যে সমাজ অথবা যুগের মুখ্য সমস্যা সেখানে মনের বাতায়ন রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রয়োজনের নিক্তিতে যেখানে জীবনের মানদণ্ড, মূল্যবোধ নির্দ্ধারিত হয় সেখানে মনের বাতায়ন থেকে অবারিত আকাশকে দর্শন অথবা সঙ্গীতের রাগরাগিণী সৃষ্ট সুরলোকে বিহার করা নিছক বিলাস বলে পরিগণিত হবে।

জৈবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে একটি কল্পলোক, মানসলোক রয়েছে তার প্রতি আমাদের চিরন্তন আগ্রহ, দুর্নিবার কামনা আজ স্তিমিত, জড়তার ভারে নমিত। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি আজ উধাও হয়ে গেছে, দৈহিক জীবনের প্রবৃত্তিকে পূরণ করবার জন্য স্থূল মন হয়েছে তার সেবাদাসী। দৈনন্দিন সংগ্রামের হাতিয়ার শানিয়ে চলেছি দিবারাত্রি।

"At present the future of mankind is dark. "Stop, look and listen"—the prudent caution and railroad crossing must be amended to read—"Stop, look, listen, and *Think*"; not for the saving of a few lives in railroad accidents, but for the preservation of the humanity.

(Alfred Korzybski, Manhood of Humanity, 20—22).

হাজার হাজার বছরের অন্ধ কুসংস্কার আজও অবচেতন মনে শিকড় বেঁধে রয়েছে। আমাদের মন থেকে সেই আদিম নগ্ন মানুষটি একেবারে বিদায় নেয়নি। দুর্বল মুহূর্তে এরা বেরিয়ে আসে অন্ধকার অবচেতনার গহ্বর থেকে। সভ্য জগতের প্রাঙ্গণে ঘনিয়ে আসে অমাবস্যার আঁধার ঘনরাত্রি। যুদ্ধ দাঙ্গার ভিতর সেই আদিম বন্য মানুষটির শুরু হয় নৃশংস বর্বর অভিযান।

সভ্য চেতন মন অসহায় নিরুপায় দৃষ্টিতে শুধু দেখে যায়। সমাজে দানবিক শক্তি যত সক্রিয়, সেই অপেক্ষা মানুষের শুভবুদ্ধি নিষ্ক্রিয়, দুর্বল অথবা সমাজের অল্প সংখ্যক আদর্শবাদী বিবেকবান লোকদের ভিতর সীমাবদ্ধ।

আজ রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যক্তি জীবনের মূল প্রশ্ন গুলি এড়িয়ে আমরা নিজেদের স্বকল্পিত ভাববিলাসে ও আত্মরতিতে মশগুল হয়ে আছি অথবা দৈনন্দিন ঠুনকো সমস্যা নিয়ে আমরা সারাক্ষণ ব্যস্ত। সমাজ জীবন কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত? জীবনের মূল্য বোধ কোন নিক্তিতে বিচার কোরব? সংসারে এই নিত্য হারাজিত খেলা, এর থেকে আমরা জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাই? অনাদি অতীত চির মৌন, ভবিষ্যত চির দুর্জ্ঞেয়। ক্রমপরিবর্তনের স্রোতে আমরা কোথায় ভেসে চলেছি? প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমছে মনের গহন কোণে, আমরা যথারীতি নিজেদের রচিত গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি। আজ আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা অসংলগ্ন, বেসুরো, পদে পদে আমাদের তাল ভঙ্গ, ছন্দ পতন হচ্ছে। বিকারের প্রলাপের মতো আমাদের জীবনের তারগুলো বেজে চলেছে। পৃথিবীর গতির একটি ছন্দ, জীবনের একটি সুর, বাঁচার একটি নিগূঢ় অর্থ রয়েছে। যারা জীবনজিজ্ঞাসু তারা হৃদয়ে এই ছন্দ অবিরত অনুভব ও এই অর্থকে খুঁজে পাবার জন্য আজীবন তপস্যা করেন।

"Life has meaning, to find its meaning is my meat and drink" (Browning) দার্শনিক হলেন মূলতঃ জীবন জিজ্ঞাসু ও সত্যাগ্রহী। তার তপস্যা হোল সম্যক্ দৃষ্টি, আঁধারের পরপারে জ্যোতির্ময় সত্যকে অবলোকন করা।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

এই সত্য অবিশেষ, অমূর্ত, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সত্য হোল সত্তার স্বাক্ষর, জীবন রসে চির সঞ্জীবিত। জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সত্যের নির্মল আলোকে, সত্য মূর্ত হয় জীবন সংগ্রামের তীব্র ঝঞ্ঝারে, চৈতন্যের লীলা অভিরামে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যাদের চোখ ধাঁধিয়ে নেই, তাদের চোখ প্রতিভাত হয় নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতো সত্যের অমলিন, অম্লান মূর্তি। সত্যকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করার পিছনে রয়েছে দুঃখবরণ ও আমরণ তপস্যা। এই বেদনারক্ত পথ চলতে চলতে যাত্রী অনুভব করেন অপার আনন্দ, মৃত্যুর গহন অন্ধকার পার হয়ে সে পায় অমৃতের সন্ধান।

আজ শুধুমাত্র বাঁচবার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে হলে অথবা তার চির সমাধান পেতে হলে আমাদের নিছক ভাবাবেগ অথবা অঙ্কমত্ততার উপর নিজেদের ছেড়ে দিলে চলবেনা। আমাদের পথ হচ্ছে স্বচ্ছ চিন্তাধারা, গভীর আত্মজিজ্ঞাসা। আমাদের তথাকথিত ব্যবহারিক জীবনের সীমানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভের প্রাচীরে আবদ্ধ। জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়ে অন্য কিছু ভাববার অবকাশ আমাদের নেই বললেই চলে। অন্ধ কুসংস্কার ও কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মের জালে আমরা চিরবন্দী। স্থির, নিশ্চিত সসীম জগতের এককোণে উদ্বেগহীন চিত্তে কাল অপহরণ করা অথবা অল্প আয়াসে জীবনের জের টেনে চলা আমাদের সাধারণ জীবনের একমাত্র কামনা, মাঝে মাঝে শোক, দুঃখ, তাঁর বেদনা দমকা হাওয়ার মতো এসে আমাদের তরীর নোঙর ছিঁড়ে মাঝগঙ্গায় নিয়ে যায়। অজানাকে জানবার দুরন্ত কৌতূহল, অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেবার দুর্নিবার আকাঙ্খা আমাদের অধীর করে তোলে। বাঁধা বন্ধন হীন অসীমের লীলাপথে নিত্য যাত্রা করে চিরউদাসী দার্শনিক মন। আটপৌরে জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে অজানা দুয়ারে আঘাত

করবার দুঃসাহস দর্শন জগতের পথিকদের প্রতিনিয়ত চালনা করছে। এই অজানা পথে পথিক হবার দুঃসাহস আছে বলেই দার্শনিক হন সংস্কার মুক্ত, নির্ভীক ও মৃত্যুঞ্জয়ী।

বিশ্বাসের সরল পথ ধরে মরমী সাধকেরা তাদের অভীপ্সিত বস্তুকে পাবার সাধনা করছেন। প্রেম, অনুরাগ, মৈত্রী সাধনার পথ ধরে সাধক এগিয়ে চলেন, সেই পথে তার সন্দেহ বা প্রশ্নের তীক্ষ্ম শলকা অনুক্ষণ বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। দুর্বার ভাবাবেগ প্রেমিক চিত্তকে জোয়ারের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দার্শনিকের পথ মরমী সাধকদের পথের মতো সরল সমান্তরাল রেখায় অঙ্কিত নয়। দার্শনিক গোড়া থেকে কোন বস্তুকে সত্য বলে গ্রহণ করেন না। অবিশ্বাস, সংশয় সন্দেহের ঢেউ তার বুকে প্রতিনিয়ত দুলছে। নানা আঁকাবাঁকা পথ ধরে, চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে তার মানসযাত্রা সদা সর্বদা এগিয়ে চলে। মতুয়ার বুদ্ধিকে আশ্রয় না করে সংশয়ের আগুনে দহন হয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা হোল দার্শনিকের সাধনা।

" Philosophy removes the some what arrogant dogmatism of those who have travelled into the region of literating doubt and it keeps alive our sense of wonder by showing familiar things in an unfamilar aspect." (Bertrand Russell).

মতুয়া বুদ্ধির উগ্র গোঁড়ামির অসুস্থ আবহাওয়া থেকে দর্শন আমাদের মুক্ত করে মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে, আর এ ছাড়া সাধারণ অতি পরিচিত বস্তুকে নতুন ও অপরিচিত পরাপ্রেক্ষিত থেকে উপস্থাপিত করে আমাদের মনে এক অনন্ত বিস্ময় ভাবও অসীম কৌতুহল স্পৃহা চির জাগ্রত করে রাখে।

রক্ষণশীল মনোভাব, গোঁড়ামি, মতুয়ার বুদ্ধিকে আশ্রয় করে অথবা পাটোয়ারী বুদ্ধি কৌশলে দার্শনিক চিত্তবৃত্তির উন্নয়ন ও অথবা সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। গুটিকয়েক নীতিকে নির্বিচারে গ্রহণ করে পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে ফতোয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবেনা। মন যেখানে নিঃসংশয়ে জগতকে গ্রহণ করে চলতে শুরু করে সেখানে অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার অথবা চিরাচরিত আচার হয় মনের চালক ও বিধানকর্তা। এখানে মনের বাতায়ন রুদ্ধ। বিজ্ঞান ও দর্শনের উভয়ের মূলকথা হোল এই অবরুদ্ধ প্রাচীর থেকে মনকে মুক্ত করা। জগৎ পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞান অথবা দর্শন যে কোন পথ আমরা অনুসরণ করি না কেন আমাদের মোক্ষ সাধনা হবে বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ; সতর্ক রেখে নির্মল ও মুক্তচিত্তে প্রকৃতির রহস্যাগারে প্রবেশ ও বিশ্বকে যথাযথ অবলোকন করা। নির্ভুল হওয়া, যথার্থ জ্ঞান অথবা যথার্থ বোধ বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রধান স্তম্ভ। একদিকে অন্ধ মূঢ়তা সমাকীর্ণ অপরদিকে গোঁড়ামি, শিকলবাঁধা মন এই দুই বন্ধন থেকে আমাদের সর্বপ্রথমে চাই মুক্তি। এই মুক্তির বাণী নিয়ে আসেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকরা। নির্বিচারে কোন নীতি বা মতকে গ্রহণ করা বিজ্ঞান অথবা দর্শনের ধর্ম নয়। এখানে নীতি, আচার এবং গুরুবাদের প্রতি অচলা ভক্তির কোন স্থান নেই। সন্দেহ ও বিচারের পথ অনুসরণ করে সত্যকে প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে পরিক্ষিত করে গ্রহণ করতে হবে।

Rather ! prize the doubt
Low kinds exist without
Finished and finite clods, untroubted by a spark

দর্শন বিজ্ঞানের অনুবিশ্লেষণ বৃত্তিকে (analysis) গ্রহণ করে বিচার পদ্ধতির ভিতর দিয়ে একটি সংশ্লেষণে এসে উপনীত হয়। নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণকে ভিত্তি করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান

জগতের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি কিন্তু দেশকালকে অতিক্রম করে যে ভাবলোক অথবা পরমার্থিক সত্তা বিরাজ করছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বাহন করতে হবে। পরমাণু ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বহির্ভূত কিন্তু বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেনা। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অথবা ইন্দ্রিয় সংযোগে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞান চরম সিদ্ধান্ত নয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বস্তুর স্বরূপ আমরা উদ্ঘাটন করতে পারিনা। দর্শন এই জন্য ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বৌদ্ধিক বোধ, অনুভূতি, অনুভব ও স্বজ্ঞার পথে অদৃশ্য ও আলৌকিক জগতের অনুসন্ধান, পরমার্থিক সত্তাকে উপলব্ধি অথবা সত্য সাক্ষাৎ করবার জন্য সাধনা করে। আমাদের জ্ঞানের গোচরে পৃথিবীর কতো সামান্য অংশ ধরা পড়ে। এই রহস্যময়ী প্রকৃতির মহল আজও অন্ধকার গহ্বরে লুকিয়ে রয়েছে। অনাদি অতীতের কোন মুহূর্তে আমাদের এই ঘূর্ণিমান গ্রহ পৃথিবী সূর্যালোক পান করে প্রথম প্রাণের স্পন্দন অনুভব কোরল ? কোন অজানা ভবিষ্যত দিগন্তের পানে ইতিহাসের ধারা অবরিত ছুটে চলেছে ? গ্রহ গ্রহান্তর, চন্দ্র তারা রবি কোন ছন্দে ছন্দিত, প্রকৃতি কোন নিয়ম দ্বারা চালিত ? পৃথিবী চির রহস্যময়ী, তার অবগুন্ঠন উন্মোচন করতে হবে। এর জন্য চাই মোহমুক্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টি। সাধারণ লোকের চোখ দৃষ্টিহীন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চোখ মোহাচ্ছন্ন। জীবনে জ্ঞান উন্মেষের প্রথম সূচনা হোল বিস্ময়বোধ। বিস্ময়বোধ আমাদের সুপ্ত মনকে করে জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত। এই বিস্ময়বোধ ও জিজ্ঞাসা থেকে শুরু হয় দার্শনিকের তত্ব গবেষণা (আরিস্টোটল)। রহস্যভরা পৃথিবীকে অবাক বিস্মিত নেত্রে দেখা অসীম কৌতুহল নিয়ে চারিদিকের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ধীরে ধীরে অপসারণ করে অজানা পৃথিবীর মহলের পর মহল আবিষ্কার করা দার্শনিকের সত্যান্বেষণ ও মানসযাত্রার প্রথম সোপন। যার অন্তরে এই অনন্ত বিস্ময়বোধ তরঙ্গ সৃষ্টি করেনা, অজানাকে জানবার জন্য যার চিত্ত ব্যগ্র, ব্যাকুল নয় সে তো সারাজীবন মৃত দেহ বহন করে চলেছে।

"আমাদের জীবনে সুন্দরতম অভিব্যক্তি হোল রহস্যময়ী। এই রহস্যবোধ থেকে কলা ও বিজ্ঞান উদ্ভূত হচ্ছে। যে জন এই বিস্ময়বোধের রস থেকে চিরবঞ্চিত, পৃথিবীর রহস্যকে দর্শন করবার যার অবসর নেই অথবা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, তার চোখ অন্ধ, তার জীবন মৃত্যুর নামান্তর। সর্বব্যাপী অনন্ত কাল ধরে যে সচেতন প্রাণ প্রবাহ বয়ে চলেছে তার রহস্যকে নিরীক্ষণ, বিচিত্র রূপিণী পৃথিবীর বিভিন্ন অঙ্গ বৈশিষ্ট্য যা আমাদের চোখে অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তার সম্বন্ধে অনুধাবন করা এবং প্রকৃতির লীলাতে যে বুদ্ধির অভিব্যক্তি রয়েছে তার সামান্যতম অংশকে হৃদয়ঙ্গম করা আমি আমার বৈজ্ঞানিক সাধনায় যথেষ্ট মনে করি।"
(আইনষ্টাইন)

"বিজ্ঞান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ম ও তার উৎকর্ষ সাধন করছে। বৈচিত্রপূর্ণ প্রকৃতির লীলা অভিরামকে পরিদর্শন করা অথচ তার বিভিন্ন অংশের ঐক্য সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধে কোন বিস্ময় অনুভব না করা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় হবে। ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের কথা ছেড়ে দিয়ে ও আধুনিক মন পরিদৃশ্যমান বস্তু ও বিছিন্ন ঘটনাকে একটি সূত্রে বেঁধে নিতে এবং জাগতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতরে তাদের যোগসূত্র স্থাপনা করবার জন্য তীব্রভাবে অনুভব করছে।" (সার জেমনস্ জীনস্ । দি নিউ ব্যাকগ্রাউন্ড অব সায়েন্স)।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ সর্বপ্রথম বিশ্বকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। আবিষ্কারের পথে আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি তত বিস্ময় বেড়ে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির মতো নিরপেক্ষ। তিনি ব্যক্তিজীবনের মোহ, লোভ, আশা, নিরাশা

ভয় ভাবনা সবার উর্ধ্বে জগতকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। এখানে কাব্যের উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগ অথবা কল্পনার রঙিন তুলিকা অঙ্কন নেই। সরল বিশ্বাস অথবা দৈবের উপর আস্থা রেখে বৈজ্ঞানিক চারারাস্তায় ঘুরে বেড়ান না। বাস্তব জীবনের চরম অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বস্তু ও ঘটনাকে সুসঙ্গতে ও সম্পূর্ণভাবে বিচার এবং সরল ও সহজভাবে তাকে বর্ণনা করা বিজ্ঞানের মোক্ষসাধনা।[১] যথার্থ জ্ঞান আহরণ, নির্ভুলভাবে দেখা ও সঠিকভাবে বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক জীবন ও প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির প্রকৃতি নিরাকরণের জন্য নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা, পুনরায় নিরীক্ষণ ও নতুনতর পরীক্ষার প্রয়োগ করে তথ্য আহরণ ও সত্যান্বেষণ করে চলেছে। বৈজ্ঞানিকের সাধনার মূলে রয়েছে কঠোর সংযম, সংস্কার মুক্ত চিত্ত, বস্তুনিষ্ঠ সর্তক দৃষ্টি। কার্য কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিটি বস্তুকে অনুবিশ্লেষণ বিচার করে তার সত্যকে উদ্ঘাটনা করছে। বিজ্ঞান চন্দ্রের "নাড়ি-নক্ষত্র বিচার করে দেখছে, বলছে মূলে মোহ নেই, আছে নাইট্রোজেন....." (রবীন্দ্রনাথ)। এই মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের বৈশিষ্ট। পরীক্ষামূলক পথ ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করতে বৈজ্ঞানিক নারাজ। সজাগ দৃষ্টিতে বাস্তব জগত থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ, নিপুণ বিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে অনুসরণ করা যতই ক্লান্তিকর হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দে ও সত্যান্বেষণের অবিচল নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় সেই পথ ও মত বরণ করেন।

দেশ ও কালকে ভিত্তি করে বিজ্ঞান তার পরীক্ষা, নিরীক্ষণ ও গবেষণা শুরু করে। কার্য কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিটি বস্তুকে অনুবিশ্লেষণ বিচার করে তার সত্যকে উদ্ঘাটন করছে। বিজ্ঞানে অভিব্যক্তিবাদ বলছে কোন কিছু একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয়নি। সমস্ত কালের প্রবাহে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে। সাধারণ লোক জগতকে স্থির নিশ্চেত বলে গ্রহণ করে। তার চোখেতে ক্রমবিকাশের পরিবর্তনের ধারা প্রায় অস্পষ্ট অথবা অলক্ষণীয় থেকে যায়। যা আজ অথবা যা তার চোখে পড়ছে সে সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে। এখানে বস্তুকে অনুবিশ্লেষণ করে যথাযথ স্বরূপ জানবার অনুসন্ধান নেই। কিন্তু যে সত্যকার বৈজ্ঞানিক সে যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না লাভ করছে ততক্ষণ তার সাধনার বিরাম নেই। বস্তুজগতের যথার্থ জ্ঞান আহরণ করার প্রতি বৈজ্ঞানিকের অদম্য স্পৃহা ও অবিচল নিষ্ঠা রয়েছে যাকে হাক্সলী বলেছেন "the fanaticism of veracity,"।

সাধারণ লোক পৃথিবীকে নির্বিচারে গ্রহণ করে। সংস্কার ও অভ্যাসের পায়ে নৈবেদ্য দেওয়া ছাড়া বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বস্তুজগতের অন্তরে প্রবেশ করতে এরা অভ্যস্ত নয়। যে জগৎ সহজে ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের চেতনায় এসে প্রতিভাত হচ্ছে সেই রূপে জগতকে গ্রহণ করা সাধারণ বুদ্ধির কাজ। এই প্রতিভাত জগৎ সত্য অথবা নিছক মনের কল্পনা সাধারণ বুদ্ধিতে এই সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈজ্ঞানিকের সর্তক দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত প্রহরীর মতো প্রতিটি বস্তুকে অনুবিশ্লেষণ করে গ্রহণ করছে। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ ও গবেষণার পথ অনুসরণ করে। রহস্যময় জগতের একটির পর অপরটি বহিরাবরণকে উন্মোচন ও অপসরণ করে বিশেষ বিষয়ের বিশয় সাধারণ, নিশ্চিত, যথার্থ এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান প্রদান করা হোল বৈজ্ঞানিকের মোক্ষসাধনা। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করেন না, বরং চিত্তকে শোধন ও নির্ভুল

১. Science is the complete and consistent description of the facts of experience in the simplest possible terms. (J. Arthur Thomson)

পথে চালনা করবার জন্য বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষামূলক গবেষণা, নতুন নতুন তথ্যকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পথে মশাল হিসেবে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞান যত শক্তিশালী, সম্পূর্ণ হউক না কেন দর্শনের স্থান কখনও অধিকার করতে পারবেনা। বিজ্ঞান শুধুমাত্র দর্শনের সমস্যা উত্থাপন করছে, সমাধানের পথ তার অজানা। এই অনন্ত বিশ্বে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ যথা প্রাণীবিদ্যা বিশারদ মনস্তত্ত্ববিদ্ অথবা পদার্থ বিজ্ঞানী একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এই বিশেষ ক্ষেত্র অনন্ত বিশ্বের কতটুকু স্থান জুড়ে বসে আছে অথবা জগতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রের কোন যোগসূত্র আছে কিনা সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী আমাদের আলোক প্রদান করতে পশ্চাৎপদ হবেন। বস্তুজগতের বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে মানবচিত্তের অথবা দ্রষ্টার কোন সম্বন্ধ অথবা যোগাযোগ রয়েছে কিনা এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহল নীরব। বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, কিন্তু মনের অগোচরে বস্তুর অস্তিত্বকে প্রমাণ ও তার স্বরূপকে বর্ণনা করা যুক্তিসাপেক্ষ কিনা সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের মনে কোন প্রশ্ন উদয় হয়না।

বৈজ্ঞানিক পরিদৃশ্যমান জগতের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে যথা অণুপরমাণু থেকে শুরু করে গ্রহ গ্রহান্তর কেমন করে বিচরণ করছে অথবা প্রাণীজগতে জীবনের ক্রিয়ার একটি সঠিক বিবরণ আমাদের ধরে দিতে সক্ষম। কিন্তু আমরা যদি বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করি কেন অণুপরমাণু অথবা গ্রহপুঞ্জ অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে অথবা জীবনের এই রূপ রস গন্ধ ভরা বিচিত্র ধারা কোন উৎস থেকে চির উৎসারিত, পরিবর্তনের স্রোত, কালের নিরন্তর যাত্রা কেন এতো বিচিত্ররূপে ও বিভিন্নভাবে বয়ে চলেছে? পঞ্চভূতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের জীবন যাত্রা? জৈবিক প্রবৃত্তির সংঘাতে সৃষ্টি হচ্ছে মনের আবেগে নব নব রসের সঞ্চার? আমাদের হৃদয়গভীরে আত্মা অথবা চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ চিরবহ্যিমান অথবা এই বিশ্বচরাচরের পশ্চাতে কোন ইঙ্গিত অথবা উদ্দেশ্য হয়েছে? এই জগতে যন্ত্রের পুতুলের মতো পূর্বনির্ধারিত স্রোতে ভেসে চলেছি অথবা আমাদের অন্তরে জ্বলছে চেতনালোক যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা চলেছি ক্রমবিকাশের পথে? সংসারে কিছু কিছু সংখক আছেন যারা শক্তিমদে গর্বিত হয়ে সত্যকে মসীলিপ্ত, প্রেম মৈত্রীকে দানবিক, আসুরিক শক্তি প্রয়োগে লুণ্ঠিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, পক্ষান্তরে কিছু দুর্লভ আর্বিভাব পৃথিবীতে হয়েছে তারা কেন সত্যকে সাক্ষাৎ করবার জন্য আজীবন দুঃখ বরণ, মৃত্যুসিন্ধু অমৃতলোকের পথিক হবার জন্য কায়মনে সাধনা করে চলেছেন? জন্মমৃত্যুর রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে? ব্যক্তিমানসের চেতনার কষ্টিপাথরে অথবা সামাজিক জীবনের মাপকাঠিতে সত্যের মূল্য নির্ধারিত হবে? কেমন করে বস্তুজগতের একটি বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করছে এই নিয়ম নিউটন অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়। কিন্তু কেন একটি অপরকে আকর্ষণ করছে তার উত্তর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহল নীরব থাকবেন। এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক জগৎ অতিক্রম করে দর্শনের জগতে প্রবেশ করি। আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা ক্রমশঃ অঙ্কশাস্ত্র অথবা প্রতীকবাদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার জন্য বিশেষ থেকে অবিশেষ, মূর্ত থেকে অমূর্ত ভাবলোকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ সুসংবদ্ধ, সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান প্রদান করে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম অথবা সামান্য সূত্র আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য।

দর্শন বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম ও সামান্য সূত্রগুলিকে সমন্বয় করে পরমার্থিক সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে থেকে সবকিছুর মূল্যায়ন করছে। "Part of the value of science is intellectual. It would be a dull mind that could see the rich variety of natural phenomena

without wondering how they are inter related. Quite apart from all questions of practical utility, the modern mind feds strongly urged to synthesise the phenomena it observes, to try to combine happenings in the external world under general laws." (Jeans : The New Background of Science).

প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র পরিদর্শন করে তাদের পারস্পারিক সম্বন্ধে যার নেত্র বিস্ময়াভিভূত হয়না তার মন বলতে হবে বুদ্ধিহীন, নিষ্প্রভ। প্রয়োজনের সমস্ত প্রশ্ন ছেড়েও আধুনিক মনের ভিতর এই বিষয় তাঁর আকাঙ্খা জেগেছে যে কি করে পরিদৃশ্যমান জগতের সবকিছু সংশ্লেষণ ও সমগ্রভাবে গ্রহণ এবং বহির্জগতের বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশিকে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভূত করা। এই সংশ্লেষণ বৃত্তি দর্শনে চরিতার্থ হয়। দর্শন সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার ও চরম পরিণতি।

দর্শন সমস্ত জ্ঞানের স্তম্ভ হলেও একথা বলা বাহুল্য যে জীবনের মূল প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দর্শন দিতে পারবে এই দাবী কোন দার্শনিক করতে পারে না। দার্শনিক সকল সমস্যার সমাধান দিতে অসমর্থ হলেও জীবনের মূল প্রশ্নগুলি হোল দার্শনিকের একমাত্র জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর পাবার জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করে চলেছেন। দর্শন যদি তার স্বকীয় ভাবধারাকে কার্যকরী করতে চায় তবে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে তার উপেক্ষা করা চলবে না। বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে আসছে দর্শনের নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নমালা।

(Philosophy, to be effective, must, however, be in constant living contact with the sciences, from which her questions come." (Haldane : The Science and Philosophy, 1330). এককথায় বলা যায় দর্শন জ্ঞানের সর্ববিভাগকে একত্রী করণ ও বিভিন্ন বিজ্ঞানকে সমন্বয় করছে। (Philosophy is integration of knowledge, the synthesis of the sciences. Dwrant Drake: Imitation to philosophy, p. ix).

জগৎ পারাবারকে সমগ্রভাবে অবলোকন করা দার্শনিকের মূলকথা। দর্শনের এই মর্মার্থ উপলব্ধি করে প্লেটো তাঁর 'রিপাব্লিক' পুস্তকে দার্শনিককে অনন্তকাল ও বিশ্বচরাচরের পরম দ্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। (Philosopher is the spectator of all time and all existence, and that he is one who sets his affections on that which really exists.

(The Republic. VI,

জীবনকে টুকরো টুকরো দেখা অথবা পৃথিবীকে খন্ড খন্ড করে বিচার করা আধুনিক মননশীলতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিজ্ঞানাগার থেকে এসেছে এই অনুবিশ্লেষণ প্রবৃত্তি। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার পথ দিয়ে পৃথিবীকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করে তার একটি বিশেষ অংশকে বিচার করছে। বিজ্ঞান যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তার বিচার ও গবেষণা শুরু করেন দর্শন সেই বিষয়বস্তুকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন না। পদার্থবিজ্ঞানী বস্তুমাত্রকে বলে গ্রহণ করে তার অনুবিশ্লেষণ করেন। কিন্তু দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তুর সন্ধান পেলেন তাকে সরাসরি গ্রহণ না করে সেই বস্তু আমাদের মানসসৃষ্ট ভাবের প্রতিমূর্তি অথবা দেশকালে অবস্থিত বাস্তব সত্তা সেই বিষয়ে তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও বিচার করেন। বৈজ্ঞানিক যত বস্তুজগৎ অথবা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালাকে একে একে পরীক্ষা অনুবিশ্লেষণ করতে করতে ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জগতে প্রবেশ করেন তত দর্শনের সঙ্গে তার নিবিড় সান্নিধ্য ও ঐক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও যথার্থ; দার্শনিক দৃষ্টি গভীরতর, মূল সন্ধানী ও ব্যাপক। দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অবহেলা করেনা কেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দর্শনের নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক যুগের

একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদ্ wholeheed বলছেন দর্শন আমাদের অন্তর ও ভবিষ্যত উভয় দৃষ্টিকে উন্মীলিত করে। এই দর্শনের ভাবলোক থেকে আমরা পেয়ে থাকি জীবন ধারণের সার্থকতা। জীবনের সকল মহৎ প্রেরণার মূলে রয়েছে এই চৈতন্য ও উপলব্ধি। দর্শন জগতের সর্বপ্রথম কাজ হোল চিন্তাগুলি যে জট পাকিয়ে আছে তাকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম বিচার প্রয়োগে ছাড়ানো ও জটিলতা থেকে চিন্তাকে শুদ্ধ, মুক্ত, নির্মল করে তত্ত্বগবেষণাকে নিয়োজিত করা। সত্য সহজ ও সুন্দর। আমরা স্বকল্পিত ভাবনারাশি দিয়ে সেই সত্যকে বিকৃত, ঐক্যকে বহুধা ভাবে খন্ডিত এবং সহজকে দুর্বোধ্য করছি। আমাদের মূলে অথবা উৎসে ফিরে যেতে হবে। এই মূলসন্ধানী দৃষ্টি জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষ দৃষ্টিতে বিশ্ববীক্ষা দর্শনের মূলকথা।

বিজ্ঞান শুধু বস্তুকে অথবা ঘটনাকে পরীক্ষা করছে, দর্শন তার অর্থ ও মূলকে বিচার করছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একদিক থেকে খন্ডিত, বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ যেমন পদার্থ বিদ্যা বিজ্ঞান পদার্থ অথবা বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করতে অথবা মনোবিজ্ঞান মনের ক্রিয়া-কলাপ, চিন্তা অনুভূতি প্রভৃতির উপর আলোকপাত করতে সমর্থ। বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞান সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ছবি অমাদের দেয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে সমাকভাবে আমরা যদি উপলব্ধি করতে চাই তা হলে আমাদের বৈজ্ঞানিক খন্ডিত দৃষ্টিকে অতিক্রম করতে হবে। শাখা প্রশাখাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিচার করে আমরা কি গাছের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পারি? সামগ্রিক দৃষ্টি ও আংশিক অথবা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এক পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন অংশকে যান্ত্রিকভাবে এক সূত্রে বেঁধে পূর্ণতায় পৌঁছান যায় না। বিচিত্র রংএর সংমিশ্রণে যে চিত্র অঙ্কিত সেটা সমস্ত রংএর যৌগিক ফল নয়, বিভিন্ন সুরের মিলনে যে অপূর্ব হার্মনী সৃষ্টি হয় সেই সুর সপ্তাত ও সামঞ্জস্য যান্ত্রিক যোগসূত্র নয়। এই ঐক্যতান অথবা চিত্রপট এক নতুন সৃষ্টি যার প্রসাদগুণ অথবা ছোঁয়াচ কোন বিশেষ সুরের প্রতিধ্বনি অথবা রংএ প্রতিফলিত হয় না। "বিজ্ঞানের পরিধি যত ব্যাপক হয় তত দর্শনের নিকটবর্তী হয়, এই জন্য কোথায় বিজ্ঞানের শেষ ও দর্শনের যাত্রা শুরু তা বলা কঠিন।"

দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, তার অখন্ড উদাস, নির্লিপ্ত দৃষ্টি পৃথিবীর সর্বপ্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সর্বজনীন দৃষ্টিপথে পৃথিবীর সমগ্ররূপ প্রতিভাত হচ্ছে। মাথু আর্নল্ড প্রাচীন গ্রীক্ কবি সোফোক্লিশ সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি জীবনকে সমগ্র ও স্থির নেত্রে অবলোকন করেছেন (He saw life steadily and saw the whole)। এই উক্তিতে দর্শনের মর্মার্থ বলা হয়েছে। জগৎ ও জীবনকে টুকরো টুকরো করে না দেখে, ব্যবহারিক অথবা প্রয়োজনের নিক্তিতে তাকে না মেপে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা দার্শনিকের মূল কথা। আমরা সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে, হাসি কান্নায় নিত্য তরঙ্গায়িত হচ্ছি, দার্শনিক এই তরঙ্গ মথিত জীবনকে তাঁর থেকে, জীবনের এই কৌতুক নাটকে নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মতো শুধুমাত্র অবলোকন করছে। এখানে অস্থির জীবনযাত্রার তরঙ্গ মনকে নিত্য চঞ্চল করেনা, মন এখানে প্রশান্ত, নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাবে বিশ্বরঙ্গমঞ্চকে অবলোকন করে তৃপ্তি লাভ করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে দার্শনিক কি জীবনের ঝড় ঝাপটাকে এড়িয়ে পলায়ন বৃত্তিকে অবলম্বন করে নিঃসঙ্গ গিরি গুহায় আশ্রম বাসী হবেন? জীবনকে অস্বীকার করা দার্শনিকের মত নয়। জীবন সংগ্রামের হলাহলের সংগে সম্পূর্ণভাবে থেকেও দার্শনিক হবেন নিরাসক্ত। যেখানে প্রয়োজন সেখানে আসক্তি, লোভের অন্ধ প্রবৃত্তির মাদকতা। সত্যিকথা প্রয়োজনের ক্ষুধা না মিটিয়ে জীবন ধারণ অসম্ভব, স্বপ্নবিলাস বলে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের দাঁড়িপাল্লায় যদি সারা জীবন

নিজেকে মেপে চলি সেই জীবন হবে অতিমাত্রিক যান্ত্রিক, ব্যবসায়ী বুদ্ধি সুচতুর জীবন (pragmatic) অথবা নিছক পশুজীবনের নামান্তর। শিল্প, কাব্য ও দর্শন আমাদের মোহমুগ্ধ জীবনকে প্রবৃত্তি স্বার্থ সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে ক্রমশঃ সৌন্দর্য অনুভূতি, রসআস্বাদন ও আনন্দলোকের যাত্রী করে তোলে। ব্যক্তিগত জীবনের লোভ, অন্ধ প্রবৃত্তির সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে দার্শনিকের দৃষ্টি ছাড়িয়ে রয়েছে নিখিল বিশ্বের বিপুলা অঙ্গনে। ঋগ্বেদে কবি ও দার্শনিককে একই স্থলে অভিষিক্ত করা হয়েছে। কবির্নচক্ষাঅভিষীমচষ্ট (ঋগ্বেদ ৩।৫।৪।৬) সূর্য যেমন আকাশে অবস্থান করে সমস্ত জগতকে পরিদর্শন করেন তেমনি কবিদ্রষ্টা আত্মস্বরূপে বিশ্বচরাচরকে অবলোকন করেন। নিরাসক্ত চিত্তে জ্ঞানজগতে বিহার করা দার্শনিকের কর্ম। জ্ঞানপ্রীতি থেকে ইংরেজীতে যথা Philos (প্রেম অথবা প্রীতি) ও Sophia (জ্ঞান) এই দুই শব্দের সংযোগে Philosophy অথবা দর্শন কথার উৎপত্তি হয়েছে। দার্শনিক হলেন সত্যিকার জ্ঞানী। এখানে জ্ঞানী অর্থে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করা নয়, তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। তত্ত্বজ্ঞান অথবা অধিবিদ্যা হোল দর্শনের মূল বিষয়বস্তু। অধিবিদ্যা অথবা Metaphysics অধ্যায়নে আমরা বিশ্বচরাচরের অন্তর্নিহিত পরমসত্তাকে জানা ও উপলব্ধি করবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। হংস যেমন দুগ্ধ মিশ্রিত জলে দুগ্ধ জল থেকে সরিয়ে পান করে সেইরকম দার্শনিক অনিত্য, পরিবর্তনশীল, স্থূল জগৎ থেকে নিত্য শাশ্বত, চিরন্তন সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার একান্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। দার্শনিককে বলা হয় তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি পৃথিবীর তত্ত্ব অথবা সার-বস্তুকে উপলব্ধি করেছেন তার নিকট জ্ঞানলোকের সমস্ত দুয়ার হয়েছে উন্মুক্ত। এক কথায় তিনি হলেন ব্রহ্মজ্ঞ অথবা সর্বজ্ঞ। দার্শনিকের উদার চিত্তে পৃথিবীর সব আলো এসে পড়েছে, তিনি সর্ব প্রান্তর থেকে রস গ্রহণ করছেন, কোথাও বিশিষ্ট কোণে তাঁর চিন্তা জট বাঁধছেনা। প্রতিটি বিষয় বিচার, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে অনুবিশ্লেষণ করে প্রবাহমান চিন্তার নির্মল স্রোতে অবগাহন করছেন।

দার্শনিক মনের বাতায়ন অবরুদ্ধ করে রাখবেনা। সবার মতকে ধৈর্য ধরে শুনবে, কিন্তু সবার সুরে সুর মিলিয়ে চলবেনা। স্বকীয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে নিজের পাথর সন্ধান নিজে উৎঘাটন করবে। বাইরের রূপ বৈচিত্র্যে তার মন হবেনা মোহমুগ্ধ। নিজের মনগড়া কোন কল্পনাকে আশ্রয় অথবা কোন মতবাদের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর পথ চলা চলবেনা। ব্যক্তির পায়ে আত্মনিবেদন না করে ব্যক্তির উর্ধ্বে যে সত্যবস্তু বিরাজ করছে তার প্রতি যেন তার শ্রদ্ধা অটুট থাকে। সত্য হবে তাঁর একমাত্র কাম্যবস্তু। এই সব গুণাবলীর সঙ্গে যদি তাঁর প্রেমশক্তি ও ধৈর্য থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির রহস্যাগারে প্রবেশ ও স্বচ্ছন্দে বিহার করা সম্ভব।

দার্শনিক আজীবন চলতে ভালবাসেন। সব পথ মতকে নিজের জীবন দিয়ে পরীক্ষা করে, শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করছেন, প্রেয়:কে পরিত্যাগ করছেন। কোথাও সংস্কারের গন্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ বা কোন বিশিষ দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের চিন্তাধারাকে সীমাবদ্ধ করার তাঁর প্রয়াস নেই। দার্শনিক হলেন মুক্তপথের পথিক, তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সত্যকে পাবার সাধনা করেন কায়মনে, বিত্তবান, জ্ঞানী, পন্ডিত হবার আশা নিয়ে নয়। সত্যাগ্রহ আমাদের জীবনকে করে বীর্যবান, নির্মোহ, নির্মল, পথকে সুন্দর, চিত্তকে করে ভয়শূন্য ও চৈতন্যময়। কবি লেসিং (Lessing) এই জন্য বলেছেন যদি সর্বশক্তিমান ভগবান এক হস্তে সত্য অপর হস্তে সত্যাগ্রহকে ধারণ করে আমাকে যে কোন একটি বর গ্রহণ করতে বলেন আমি সবিনয়ে বিনা দ্বিধায় সত্য থেকে সত্যাগ্রহকে চেয়ে নেব। সত্য কঠিন, তার প্রসাদ, পুরস্কার, দুঃখ বেদনারক্ত পথে বীর্যের সঙ্গে আত্মত্যাগের অগ্নিশলাকায় নিত্য দহন হয়ে নির্মোহ চিত্তে

গ্রহণ করতে হয়। যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছেন তার জীবন স্থির অটল, মন নির্বিকার ও চিরপ্রশান্ত। তিনি হন সব পেয়েছির নিত্য অধিবাসী।

To bear all naked Truth
And to envisage circumstances, all calm
That is the top of sovereignty

জীবন বিমুখতা, পলায়নবৃত্তি থেকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসারিত হয় না। জীবনকে অস্বীকার করে নয়, পক্ষান্তরে জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে, যেখানে জীবন কানায় কানায় পূর্ণ সেই পরিপূর্ণ দৃষ্টি হয় অখন্ড, উদাস নির্লিপ্ত। দর্শন জীবনকে পূর্ণতার আস্বাদন দেয়, জীবন দর্শনের আলোতে উদ্ভাসিত, সার্থকতা ও আপন মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ভারতীয় দর্শন বলছে কামলোকের উর্ধ্বে প্রাণলোক, প্রাণলোকের উর্ধ্বে রূপালোক, রূপ থেকে অরূপ ও আরও উর্ধ্বে আনন্দলোক বিরাজ করছে। সাধারণ লোক কামলোকের অধিবাসী, কর্মযোগী, যোদ্ধা বীরবৃন্দ প্রাণলোককে অধিকার করে আছে, রূপলোকে শিল্পী নতুন নতুন মহলের সন্ধান দিয়ে চলেছেন, অরূপলোকে দার্শনিক ভাবসাধনা ও ধ্যানে নিমগ্ন, যোগী, মরমী সাধু আনন্দলোকে নিত্য বিহার করছেন। দার্শনিক যখন তথ্য থেকে তত্ত্বকে বরণ করে তখন তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিত্য শাশ্বত ভাবলোকের দুয়ার উন্মুক্ত করে, তিনি লাভ করেন প্রাণের আরাম, মনের তুষ্টি, আত্মার আনন্দ। সাধনার পথে, ধ্যানের আলোতে, অনুভূতির আনন্দে এই তত্ত্বজ্ঞান, বিশ্ববোধ অথবা আত্মোপলব্ধি করা দর্শনের মূলমন্ত্র। আমাদের দেশে কাব্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সবকিছু মানুষের অনুভূতির কেন্দ্রকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তোলবার সাধনা করছে। এই পথে দার্শনিক যত অগ্রসর হবে তত তার কাছে মহলের পর মহল হবে প্রকাশিত। এই পথযাত্রায় দার্শনিককে হতে হবে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রাতে জীবনের সমস্ত রুদ্ধ দুয়ার হবে উন্মুক্ত, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত সংস্কার, লোভও কলুষতা তার মনকে করবে না স্পর্শ। দার্শনিক হবেন নির্মম, চেতনালোক ও তার বহ্নিশিখাতে চির বহ্নিমান। যুগের নানা পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ও ঘটনারাশির ভিতর তিনি হবেন অতন্দ্র প্রহরী। ব্যক্তিজীবনের লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ, শোক বেদনার তরঙ্গে তার বক্ষস্থল উদ্বেলিত অথবা তীব্র ঝঙ্কার সৃষ্টি করছেনা। তিনি প্রশান্ত মনে, আবেগহীন চিত্তে, নির্লিপ্ত দর্শকের মতো সমস্ত কিছুকে গ্রহণ অথবা অবলোকন করছেন। সত্যকে প্রত্যক্ষ, সত্তাকে উপলব্ধি করা দর্শনের মূল কথা, এই উপলব্ধির আনন্দ লাভ করা হবে দার্শনিকের জীবনাদর্শ। এই পথে ক্লান্তি নেই, নেই নৈরাশ্যের ঘনছায়া, শুধু আছে বুদ্ধির দীপ্তি, চেতনার অমলিন আলো, বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত পথযাত্রা পদে পদে আবিস্কারের আনন্দ ও উপলব্ধির অপার শান্তি ও গভীরতা।

রবীন্দ্র রচনা সূচী

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

মানসী

মানসী মাসিক পত্র ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়—সম্পাদকসংঘে ছিলেন ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবরতন মিত্র। পরে যতীন্দ্রমোহন বাগচী অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পর নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় এই পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। অষ্টমবর্ষ হইতে মর্মবাণী পত্রিকা ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়, পত্রিকাটির নাম হয় মানসী ও মর্মবাণী; ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অন্যতর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৩৩৬ পর্যন্ত পত্রিকাটি চলিয়াছিল।

প্রথম ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩১৫ — মাঘ ১৩১৬

ফাল্গুন ১৩১৫

সূচনা

'মানসী' প্রকাশ উপলক্ষে শুভকামনাজ্ঞাপক নিবন্ধ ?

অপ্রকাশিত

চৈত্র ১৩১৫

কবির স্মৃতি

নবীনচন্দ্র সেনের 'স্মৃতিরক্ষার্থ কি করা কর্তব্য এই প্রশ্নের উত্তরে' চট্টগ্রাম সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত পত্র [২]

অপ্রকাশিত

আশ্বিন ১৩১৬

বর্ষার গান : 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর'

গীতাঞ্জলি

কার্তিক ১৩১৬

আবাহন : 'এস হে এস সজল ঘন'

গীতাঞ্জলি

দ্বিতীয় ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩১৬—মাঘ ১৩১৭

ফাল্গুন ১৩১৬

গান : 'হেথা যে গান গাইতে আসা'

গীতাঞ্জলি

আষাঢ় ১৩১৭

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহরি সেনকে লিখিত পত্র, ১৬ পৌষ ১৩১৬

অপ্রকাশিত

ভাদ্র ১৩১৭

নামগান : 'গর্ব করে নিইনি ও নাম'

গীতাঞ্জলি

আশ্বিন ১৩১৭

শেষ

শান্তিনিকেতন, ১২

তৃতীয় ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩১৭ — মাঘ ১৩১৮

ফাল্গুন ১৩১৭

আলো-আঁধারে : 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে'

গীতিমাল্য

আশ্বিন ১৩১৮

ধরা পড়া : চাঁদের সাথে চকোরীর [৪]

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৩৫-৩৬

চতুর্থ ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩১৮ — মাঘ ১৩১৯

কার্তিক ১৩১৯

তবু মরিতে হবে [৪]

কবিতা : অপ্রকাশিত

পঞ্চম ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩১৯ — মাঘ ১৩২০

আশ্বিন ১৩২০

শরৎকাল [৫]

"আবার শরৎকাল আসিয়াছে....."। আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮১

অপ্রকাশিত

বৈশাখ ১৩২০

চিঠি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ২৯ ভাদ্র ১৩১৯

'রেখাচিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

ষষ্ঠ ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩২০ — মাঘ ১৩২১

চৈত্র ১৩২০

ফাগুন দিনের সকালে

গীতিমাল্য, "কার হাতে এই মালা তোমার"

সপ্তম ভাগ ॥ ফাল্গুন ১৩২১ — মাঘ ১৩২২

আষাঢ় ১৩২২

প্রেমের পরশ

বলাকা, "হে ভুবন"

মাঘ ১৩২২

মানসী

বলাকা, "আজ প্রভাতের আকাশটি এই"

১॥ (জগদিন্দ্রনাথের ভাষায়) "মানস-তপোবন হইতে শঙ্কিতচরণে পাঠকবর্গের প্রাসাদ অভিমুখে প্রয়াণকালে" মানসীর উদ্দেশে, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় বনদেবতাদের আশীর্বাদ উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেন—কবিতাটি নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল।

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি
শ্ছায়াদ্রুমৈ র্নিয়মিতার্ক ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।

মাঝে মাঝে পদ্মবনে
পথ তব হোক মনোহর !
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি
ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পথধূলি
অতি মৃদু পুষ্পধূলিনিভ
হোক বায়ু অনুকূল
শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

২॥ বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বলিয়া চিঠিখানি এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

৩॥ এটি 'কল্পনা'র "প্রকাশ" (১৩০৪) কবিতার পূর্বরূপ। যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নিকট 'কল্পনা'র কবিতার পাণ্ডুলিপি সংবলিত রবীন্দ্রনাথের একটি খাতা ছিল, তাহা হইতে সম্পাদক মানসী পত্রে এটি প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। ঐ খাতা হইতে রবীন্দ্ররচনাবলী সপ্তম খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়ে কল্পনার আরও কোনো কোনো কবিতার পূর্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ধরা পড়া" কবিতাটি মানসী পত্রে আর্ট পেপারে রঙিন কালিতে স্বতন্ত্র মুদ্রিত ক্রোড়পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—"মানসী পূজার পসরা"। সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল—"কবিতাটি কবির যৌবনকালের রচনা-কল্পনাকুঞ্জের একটি অনাঘ্রাত কুসুম।"

৪॥ এই কবিতাটিও রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত খাতায় অপরের (সম্ভবতঃ যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের) হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল।

৫॥ ঠাকুরবাড়ির 'পারিবারিক' খাতা হইতে ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রে পুনর্মুদ্রিত। যৌবনের রচনা-নিদর্শনরূপে এই সংখ্যাতেও পুনর্মুদ্রণ করা হইল।

রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন

কবির স্মৃতি

বোলপুর

চট্টগ্রাম সম্মিলনী সম্পাদক মহাশয়েষু
সবিনয় নিবেদন,

আপনারা আমাকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কবির স্মৃতি রক্ষা কেমন করিয়া করিতে হইবে? সেজন্য ত কাহাকেও চেষ্টা করিতে হয় না। কৃত্তিবাসের স্মৃতি নিজেকেই নিজে এতকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বড় কবি তাঁহারা নিজের কাব্যেই নিজের তাজমহল তৈরী করিয়া যান।

বর্ত্তমান কালে ছবি বা পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্মান প্রকাশের চেষ্টা হইয়া থাকে। সাহিত্য-পরিষদ যদি সেরূপ কোনো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহাতে দোষ দেখি না।

কিন্তু আমাদের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের উপায়রূপে প্রচলিত। জয়দেবের বিখ্যাত মেলা তাহার প্রমাণ।

শুনিয়াছি সিন্ধুদেশের কোনো লোক-বিখ্যাত কবির মৃত্যুদিনের মেলায় সেখানকার লোকেরা সমস্ত রাত্রি সেই কবির কাব্য গান করিয়া থাকে। কতকাল হইতে বর্ষে বর্ষে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, এজন্য কোনো সভা সমিতি বা চাঁদার প্রয়োজন হয় নাই। কবির নিজেরই কীর্ত্তির সাহায্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ইহার মত সুন্দর পদ্ধতি আর ত কিছু জানি না।

কবির জন্ম বা মৃত্যুর দিনে তাঁহার জন্মস্থানে বা সাহিত্য-পরিষদে বা নানাস্থানে তাঁহার কাব্য পাঠ—, ব্যাখ্যা, আলোচনা প্রভৃতি প্রচলিত হইলে উপযুক্তরূপে তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করা হয়।

আমার মতে সাহিত্য-পরিষদে আমাদের দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-বীরের জন্মদিনে বা মৃত্যুদিনে তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা উৎসব করা উচিত। অবশ্য ছোট বড় সকলেই একরূপ সমাদর করিলে তাহার গৌরব থাকিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান মৃত কবির জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের, সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার হাতের লেখা চিঠিপত্র ও কাব্যের পাণ্ডুলিপি, তাঁহার বংশাবলী ও জীবনীর সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইতে পারিবে।

যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আমার এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষৎকে জ্ঞাপন করিতে পারেন। ইতি ৩রা চৈত্র ১৩১৫

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
—মানসী চৈত্র ১৩১৫

তবু মরিতে হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শস্যভরা বসুমতী শ্যামল শোভন অতি
মধুর নদীর গতি তরল রবে,
বসন্তে ভরিয়া বোঁটা ভালবাসি ফুলফোটা
ভালবাসি চাঁদ ওঠা সাঁঝের নভে।
হর্ষহিয়া নিরুদ্দেশা দক্ষিণে বাতাসে মেশা
ফুলের গন্ধের নেশা আসিত যবে;
কতদিন হাসিমুখে গেছে কেটে সকৌতুকে
কত প্রেম কত সুখে কত গরবে,
তবু মরিতে হবে।

হাসিভরা আঁখি কালো মরমে জ্বলিত আলো,
জীবনে কত না ভাল বেসেছি সবে।
কত আশা বক্ষ ভরি রয়েছে আঁকড়ি ধরি,
শিরা হতে ছিন্ন করি ছিঁড়িয়া লবে।
ছিল মনে দীন হীন, শুধে যাব সব ঋণ,
জীবনে বিদায় দিন আসিবে যবে।
শুধু করে গেনু খেলা স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
অবহেলা সারাবেলা কাটানু ভবে
তবু মরিতে হবে।

—মানসী কার্তিক, ১৩১৯

শরৎকাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি। এই প্রথম বর্ষা অপগমে প্রভাতের প্রকৃতি কি অনুপম প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কি এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোনাকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে সে সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ুহিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে, কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে না মন্দমুগ্ধ আলসো অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে বুঝা যায় না। শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। কবিতার মধ্যে অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—মনে হয় ও একটা কবিতার অলঙ্কার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশীর

শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কি যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি। নহিলে "বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা" কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার যো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতি তরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে তাহাদের রহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহা বিস্মৃত, অতি বিস্মৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরৎকালের সূর্যালোকে আমার এইরূপ অবস্থা হয়। দুই একটি জীবনের ঘটনা দুই একটা অতীতকালের মধুর শরৎ মনে পড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে সকল শরৎকাল মনে পড়ে না, যে সকল ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন-চারের পূর্বে একটি ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন চার পূর্বে একটি শরৎকাল আমি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। বাড়ির প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরো দু একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশে পাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়া ছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সন্তরণ করিতাম। বোধহয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।

এক মুহূর্তের জন্য প্রগাঢ় সুখ অনুভব করিলে, সেই মুহূর্তকে যেমন আর মুহূর্ত বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় যেন তাহার সহিত অনন্তকালের পরিচয় ছিল, বোধ হয় আমারও সেইরূপ এক শরৎকাল রাশীকৃত শরৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই শরতের মর্মের মধ্য দিয়া যেন বহুসহস্র সুদূর শরৎপরম্পরা দেখিতে পাই—দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণী যেমন অবিচ্ছিন্ন সংহতভাবে দেখা যায়, সেইরূপে—অর্থাৎ সব শুদ্ধ মিলিয়া একটা নিবিড় শারদ আনন্দের ভাবরূপে।

আমার মনে হয় স্বভাবতঃই শরৎকাল স্মৃতির কাল এবং বসন্ত বর্তমান আকাঙ্ক্ষার কাল। বসন্তে নবজীবনের চাঞ্চল্য, শরতে অতীত সুখদুঃখময় জীবনের পূর্ণতা। বাল্যকাল, না গেলে যেন শরতের অতলস্পর্শ প্রশান্তি অনুভব করা যায় না।

আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮৯।

—মানসী আশ্বিন ১৩২০

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

আলোচনা

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রা যদিও মূল্য নির্ণয়ের মান, তা হলেও তার মধ্য দিয়ে যখন চাহিদা প্রকাশ পায়, তখন দেশে মুদ্রার বাহুল্য ও অন্যান্য জিনিষের ঘাটতি হলে মুদ্রার দাম হ্রাস পেতে থাকে। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যই Prof. Irving Fisher তাঁর Quantity Theory of moneyতে প্রকাশ করেন। একটি মুদ্রা যদি পর পর তিন বার ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তা হলে তা তিনটি মুদ্রা, যা বাজারে একবার মাত্র উপস্থিত হয়েছিল, তার সমান। এ ছাড়া মুদ্রা বলতে শুধু সরকারের ছাপানো নোট বা প্রচলিত ধাতুমুদ্রাই বোঝায় না। ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে বহু লেনদেন, কেনাবেচা সংঘটিত হয়। সুতরাং চেকও মুদ্রার সামিল বলে গণ্য হয়।

একটি রাষ্ট্র চালাতে গেলে বহুতর অর্থের প্রয়োজন। দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগে আয় সামান্য, কিন্তু ব্যয় প্রচুর। এই কারণে সরকারকে প্রত্যেক বছর প্রয়োজনানুসারে আয়ের উৎস ও প্রবাহ নির্দ্ধারণ করতে হয়। কর বসিয়ে আয় আদায় করা হয়; কিছুটা জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে। এই দুই পদ্ধতিতে সীমাহীন আয় করা চলে না। ট্যাক্সের হার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করলে, লোকে নিপীড়িত হয় ও আদায়ের অঙ্ক অবশেষে কমে আসে। ঋণেরও সীমা আছে। সাধারণের সাধ্যাতিরিক্ত ঋণ চাইলে, গ্রাহকের অভাবে তা বিফল হয়। অবশ্য আজকাল বিদেশী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রও অনুন্নত রাষ্ট্রদের ঋণ দেয়। কিন্তু ঋণ নেওয়া মানেই ভাবী বংশধরদের ওপরে ঋণ শোধের বোঝা চাপানো, অর্থাৎ বর্তমানের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎকে বাঁধা দেওয়া। এই সব কারণে সরকার আর একটি উপায়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তা হচ্ছে নোট ছাপানো। এটা অতি সহজ কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উপায়। কারণ দেশে কাগজের টাকা বাড়িয়ে যদি জিনিসের সরবরাহ না বাড়ানো যায় তা'হলে জিনিসের দাম চড়ে এবং দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে, মুদ্রাস্ফীতি করভার চাপানোরই নামান্তর। তফাৎ এই-যে মুদ্রাস্ফীতি অলক্ষিতে লোকের পকেট মারে, খোলাখুলিভাবে পাওনা আদায় করে না।

কিন্তু তাই বলে কি মুদ্রাস্ফীতি একেবারে বর্জ্জনীয়? পৃথিবীতে এমন গভর্ণমেণ্ট নেই যা কোনো না কোনো সময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে নি। যুদ্ধ লাগলে এ ব্যবস্থা ছাড়া গত্যন্তর নেই, কারণ যুদ্ধ চালাবার খরচ অতি বিষম। গত বিশ্বযুদ্ধে জার্ম্মাণীর মার্ক, ফরাসীর ফ্রাঙ্ক, ইটালীর লিরা প্রভৃতি মুদ্রার শোচনীয় ভাবে দাম পড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ না লাগলেও কোনো কোনো সরকার—বিশেষতঃ কল্যাণব্রত রাষ্ট্র মুদ্রাস্ফীতির সাহায্য নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করে। শিল্প সৃষ্টি, কল কারখানা স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নদীর বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি করে।

উদ্দেশ্য সাধু হলে মন্দ উপায়ও পরিত্যাগ করা চলে না। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি অনুন্নত দেশের পক্ষে সময় বিশেষে অপরিহার্য্য। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি আগুনের মত বাধ্য ভৃত্য, কিন্তু সর্ব্বনাশকর প্রভু। যদি আগুনে ও মুদ্রাস্ফীতি বশে না রাখা যায়, তা হলে তা সর্বস্ব ছারখার করে। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে কি পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। আমি সামান্য একটি

উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করব যে ভারতে মুদ্রাস্ফীতিতে সংযমের প্রয়োজন এসেছে। মানুষের প্রধান প্রয়োজন খাদ্য। ১৯৫২-৫৩ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন খাদ্যের মূল্য যদি ১০০ ধরা যায়, তা হলে ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে তাদের দাম নিম্নলিখিত হারে বেড়ে গেছে—

চাল গম প্রভৃতি	..	১১০
ফল তরকারী	..	১৩০
দুধ ঘি	..	১২৩
তেল	..	১৫০
মাছ, মাংস, ডিম	..	১২৮
চিনি গুড়	..	১৪০
অন্যান্য খাদ্য	..	১৭০

আমি ধৃতি সাড়ী, জুতালানী দ্রব্য, ঔষধপত্র, যানবাহন, গৃহ নির্মাণের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এসব ক্ষেত্রে দাম আরও চড়েছে। শুধু খাদ্যের পেছনেই যদি ভারতবাসীদের এত ব্যয় করতে হয়, তা হলে তারা বাঁচবে কি করে? আমাদের আয় তো এই অনুপাতে বাড়ে নি। লোকে লোহার কারখানা, জলের বাঁধ ও রেল এঞ্জিন নিয়ে কি করবে যদি তারা অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকে? সরকার বলবেন "দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমরা দায়ী নই, তোমরা প্রজনন কমাও। যদি বৎসরে বৎসরে শিশুজন্ম অত্যধিক হয়, এবং ফসল উৎপাদন তদনুপাতে না বাড়ে, তা হলে খাদ্যের দাম চড়তে বাধ্য, আমরা নিরুপায়।" এটা আংশিক সত্য, এবং সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নানা চেষ্টা করছেন। ভারতবাসীও এ বিষয়ে অবহিত হয়েছে। কিন্তু সব দোষটাই কি আমাদের? ভারত সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা নিম্নলিখিত ভাবে পোষণ করছেন—

দ্বিতীয় পরিকল্পনা	..	১১৭৫ কোটি টাকা
তৃতীয় পরিকল্পনা	..	৫৫০ " "

ধীর ভাবে বিবেচনা করতে হবে—এই উপায়ে মুদ্রা বাড়িয়ে লোককে গলাধঃকরণ করালে সুফল হবে না কুফল হবে।

আগেই বলেছি দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সাময়িক অস্বাচ্ছন্দ্যর হয়তো প্রয়োজন আছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আদি গুরু রাশিয়াও এই পথ ত্যাগ করতে পারে নি। কিন্তু দেশের লোককে বাঁচাতে হলে মুদ্রাস্ফীতির নানা রকম প্রতিষেধক অবলম্বন করা উচিত। দুঃখের বিষয় ভারত সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়।

মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভোগের দ্রব্য সরবরাহ বাড়ানো যায়, তা হলে দাম অত্যধিক বাড়ে না ও ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় দেখছি উৎপাদক কলের ওপরেই বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। সরকার বলবেন 'ভোগের দ্রব্য তৈরী হবে কি করে যদি না উৎপাদক কল আগে প্রস্তুত করা হয়?' ঠিক কথা। কিন্তু মানুষকে উপবাসী রেখে কলকারখানা বাড়িয়েই বা লাভ কি? যে হাঁস সোনার ডিম দিত সে যদি মরে যায় তা হলে সোনার ডিম আসবে কোথা থেকে? তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অংশের সীমারেখা ঠিক ভাবে টানা হয়েছে কি না সন্দেহ।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি হজম করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে হয়। কি উপায়ে এই হজমশক্তি বাড়ানো যেতে পারে? প্রথমতঃ বেকার সমস্যা সমাধান ও চাকরীর ক্ষেত্র বিস্তৃত ও বহুমুখী করা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের মাথা পিছু আয় বাড়ান। দেশে কল-কারখানা স্থাপনের জন্য চাকরীর সুযোগ কিছু বেড়েছে বটে, তবে বেকার-সমস্যা এখনও ভয়াবহ। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কৃষি বা যে সব শিল্পে অধিক শ্রমিক লাগে, তাদের দিকে ঝোঁক না দিয়ে অল্প শ্রমিক পরিচালিত, অধিক কল ব্যবহৃত বৃহৎ শিল্পের ওপরে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে বেকার-সমস্যা সমাধানের সুযোগ খর্ব করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মাথা পিছু আয় আশানুরূপ বাড়েনি। হয়ত সরকারের নিম্ন স্তরের কর্মচারী বা বড় বড় কারখানার শ্রমিকেরা বেশী মাইনে পাচ্ছে। কিন্তু দেশের অনেক লোকেরই আয় "যথা পূর্ব্বং"। এই চাপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে। কিছু দিন আগে প্রধান মন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন 'দেশের সামগ্রিক আয় বাড়ছে, অথচ সকলে তার অংশীদার হচ্ছে না, তা হলে আয়ের বৃহত অংশ কোথায় যাচ্ছে? কোন শ্রেণী তা আত্মসাৎ করছে ও আয় বণ্টনের ব্যবস্থায় কি কি গলদ বা ছিদ্র রয়েছে? প্রধান মন্ত্রী বলেছেন এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই একটি তদন্ত কমিটি বসবে। আশাকরি এই কমিটি সত্য উদ্ঘাটিত করবে এবং দেশের লোকের যন্ত্রণার অবসান হবে।

প্রফুল্লকুমার সরকার

অভিনয়ে স্বাভাবিকতা

নাটক অভিনয়ের সঙ্গে একটা কথা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কথাটা হল মঞ্চমায়া। বা ইলিউসন সৃষ্টি করেই নাটকের বক্তব্য প্রকাশ করা হয় আর এ কাজের প্রধান সাহায্যকারী হলেন নট বা নটী।

অভিনয়ের সাহায্যে জীবনদর্শনকে প্রতিভাত করানো সম্ভব একথা সত্য কিন্তু নাটক কখনই জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়। কথাটা বোধ হয় একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলা দরকার। ধরুন, আপনারা একটি ছুটির দিনে দল বেঁধে গেছেন কোন এক জায়গায় পিকনিক করতে। দলের মধ্যে ক্যামেরাধারী কোন একজন হাতে রসোগোল্লাধরা আপনার এক মনোহর মূর্তি চিরন্তন করে রেখে দিলেন। ছবিটি দেখলেই লোকে মনে করবে আপনি একজন পেটুকদাস; অথচ সমস্ত জিনিষটাই পুরো ফাঁকি হতে পারে। কারণ অন্যের ঘাড়ে আপনার মুন্ডু জোড়া দেওয়া আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে নিতান্ত অসম্ভব নয়। তাছাড়াও, আকস্মিক ক্যামেরার শব্দে আপনার পরম প্রীতিভাজন কনিষ্ঠতম কোন সদস্যও তার ভাগীদার হতে পারে—মানে স্বপ্রয়োজন ছাড়াও অনেক কিছু ঘটা সম্ভব। অথচ আপনার খাওয়ার কথাটাই সত্য হয়ে রইল।

নাটকের ক্ষেত্রেও এই আংশিক সত্যরই দেখা মেলে। নাটকের শেষ কদাচ জীবনের শেষের সঙ্গে মেলে, তার সুরু জীবনের সুরু নয়। ব্যতিক্রম থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাতেই আমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, অভিনেতব্য নাটক হ'ল রামায়ণ। দর্শকরা চোখের সামনেই দেখেন, রামের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাকান্ড, রাজ্যে প্রত্যাবর্তন, সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন মায় রামের মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত। তিনঘন্টা কি পাঁচঘন্টার মধ্যে এত সব ঘটনা ঘটানো হবে, কিন্তু যাদুকরের আমের আঁটি পোঁতা থেকে আম ফলানো আর তা দর্শকের খাওয়ানোর মত ভেল্কিবাজী একে কেউ বলবেনা! এমনকি রাবণের দশমুন্ড বিশহাত বা কুম্ভকর্ণের ছ মাসব্যাপী নিদ্রা আর একদিনের জাগরণকেও অবিশ্বাস্য বলবেনা কেউ। কারণ, দর্শকরা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নকে সর্বদা দূরে রেখেই নাটক দেখতে বসেন, নয়ত নাটকীয় রস কোনমতেই উপভোগ করা সম্ভবপর হয় না।

এই উইলিং সাসপেনসন অফ ডিসবিলিফের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে ওঠে নাটকের কাঠামো, আর তার অভিনয়। তা যদি না হত তু প্রতি মুহূর্তের অবিশ্বাসের শরাঘাতে নাট্যাভিনয়ের সমস্ত মায়ালুপ্ত হয়ে যেত, যে রূঢ় কাঠামোটুকু পড়ে থাকত, তাতে আর যাই হোক মন ভরত না, আর মনই যদি না ভরল নাটকের সার্থকতা থাকে কোথায়? তাই অবিশ্বাস্য ঘটনাও মেনেনিতে হয়, ভাবতে হয় তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আবারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, মধ্যরাত্রে স্বামী স্ত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকার নিভৃত প্রেমালাপের সময় কদাচিত কেউ আড়ি পাতলেও পাততে পারে কিন্তু নিয়মিত তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কিছুতেই সম্ভব নয়, অথচ রাতের পর রাত

হাজার হাজার দর্শকের সামনে রোমিও জুলিয়েতের কাছে প্রেম নিবেদন করে। যে প্রেমের ট্র্যাজেডির মূল কারণ হল কাউকে বলতে না পারা, সে প্রেমের বিকাশ সহস্র দর্শকের সামনে ঘটাটা কি কেউ অস্বাভাবিক বলে মনে করেও করে না, কারণ দর্শকরা এ প্রেম প্রকাশে বাধা দেয়না বরং নায়ক নায়িকার দুঃখ বেদনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায়।

দর্শকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই অভিনেতার প্রধান লক্ষ্য। যিনি নিজের সৃষ্ট চরিত্রকে দর্শকদের চোখের সামনে এমন ভাবে তুলে ধরেন যে নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁর সম্পূর্ণ ভাবে সৃষ্ট চরিত্রে লুপ্ত হয়ে যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

বঙ্গরঙ্গশালার গিরিশযুগীয় অন্যতম প্রধান স্তম্ভ অর্ধেন্দুশেখরের নীলদর্পণে রোগ সাহেবের রূপদান দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে বিদ্যাসাগর মশায় পায়ের চটি ছুঁড়ে মেরেছিলেন এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। কাহিনীর সত্যমিথ্যা বিচার না করেও একথা বলা চলে যে, অর্ধেন্দু শেখরের মত কালা আদমীর সাহেব অভিনয় বিদ্যাসাগরের মত বুদ্ধিমান মানুষেরও যখন বিভ্রম ঘটায়, তখন তা কতবড় অভিনয়! কিন্তু আজকের দিনের মাপকাঠিতে অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় হয়ত বা অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ বিচার করতে বসলে তাঁর বাচন বা অঙ্গ-ভঙ্গীতে অসংখ্য দোষ ত্রুটি আবিষ্কার নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর অভিনীত চরিত্র যে সম্পূর্ণ জীবন্ত হয়ে উঠত তার বহুনির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বহু জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে।

স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশির কুমার আমাদের কাছে বলেছেন— অর্ধেন্দুবাবুর গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ দেখলে হৃৎকম্প উপস্থিত হত। একটা কমপ্লিট ক্যারেক্টারাইজেশন। আবার বলেছেন, রডার পোষাক ছিল হাস্যকর, টকটকে লাল রঙের কোট প্যান্ট, মাথায় অ্যাডমিরালের টুপি— অথচ অভিনয়ের গুণে ও কথা কারো মনেই পড়তনা। আবার, রিজিয়া নাটকে কোন পদার্থ নেই, আমরা তবু কেটে ছেঁটে একরকম দাঁড় করিয়েছি। আগে চলত শুধু অর্ধেন্দু বাবুর ঘাতকের জন্যে।

একা অর্ধেন্দু বাবুই নয়, সে যুগের প্রায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীরই এগুণ অল্পবিস্তর বর্তমান ছিল। নাহলে সম্পূর্ণ বিদেশী কাঠামোয় বাঙলা নাট্যশালা দাঁড়াতে পারত না, বিদ্বজ্জনের মনোরঞ্জনও করতে পারত না।

এপ্রসঙ্গে গিরিশবাবুর কথা বলা বাহুল্য মাত্র। যে ভূমিকাতেই তিনি নাবুন না কেন, সে ভূমিকাই দর্শকমনকে আকৃষ্ট করেছে। বড় ছোট সব ভূমিকাতেই তাঁর অভিনয় দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করত। আবার শিশির কুমারের সাক্ষ্যই হাজির করি—গিরিশবাবু চন্দ্রশেখরে প্রথমে চন্দ্রশেখর করতেন কিন্তু দুচারদিন পরে ছেড়ে দিলেন। তখন করতেন সুন্দরীর স্বামী ঘর-জামাই। মোটা সোটা নাদুস চেহারা, গলায় পাকানো চাদর, হেলতে দুলতে এসে ঢুকতেন। সুন্দরী যখন কাছে এসে দাঁড়াত, বলতেন—চুপ, চুপ কে দেখতে পাবে। সে যখন হাঁটু গেড়ে বসে গান ধরত, বলতেন—চুপ, চুপ কে শুনতে পাবে।

চরিত্রে কিছুই নেই। মাত্র দুলাইন কথা, অথচ অভিনয়ের গুণে মনে দাগ কাটত।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দেখা অভিনয় যদি এত গভীর ভাবে রেখাপাত করে যে, পঞ্চাশ বছর পরে একই বৃত্তিজীবী আর একজন মহান নট সে কথা বলতে গিয়ে প্রশংসার ভাষা খুঁজে পান না, তে সে অভিনয়কে খুবই স্বাভাবিক অভিনয় বলতে হবে, অথচ আজকের বিচারের নিরিখে, গিরিশবাবুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অভিনয় করতেন না—একথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ দুর্নাম অবশ্য গিরিশ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানীবাবুর নামে বিশেষ প্রচলিত।

তিনি বিশেষ একটি ভঙ্গী অনুসরণ করে অভিনয় করতেন এইশুনি জনশ্রুতি। অথচ তাঁর সম্বন্ধেই কাহিনী শোনা যায়। যার সত্যতা প্রমাণ করবার মত লোক বোধ হয় এখনও জীবিত আছে। তাঁর যৌবনে দক্ষযজ্ঞ যাত্রাভিনয়ে শিবরূপে আবির্ভাবে বহু বয়স্কলোকও মূর্ছিত হয়ে পড়েন। অবশ্য অবিশ্বাসীরা বলতে পারেন, এটা তিলকে তাল করার সুপরিচিত অপকৌশল। বেশ না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, তাঁর অভিনয়ে শিবের ভয়াবহ তাণ্ডবের রূপ দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল, কিন্তু অভিনয় কি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল?

হয়ত ওঠেনি কিন্তু চরিত্রের বৈশিষ্ট পরিস্ফুটকারী অভিনয়কে অস্বাভাবিকইবা বলা যায় কোন হিসাবে! মোগল পাঠান ও সরমার নাট্যকার (এ কাহিনী আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন কারো কাছে শোনা) বলেছিলেন যে, মোগল পাঠানের প্রথম অভিনয় রজনীতে দানীবাবুর সংলাপ শুনে তাঁর সন্দেহ যে তাঁর লেখা নিশ্চয় বদলানো হয়েছে। সন্দেহটা দানীবাবুর কাছে প্রকাশ করাতে তিনি মর্মাহত হলেন। তাঁর মত অক্ষর পরিচয়হীন লোকের সম্বন্ধে এ সন্দেহ করা তাঁকে একান্ত অপমানিত করারই নামান্তর। পরে দেখা গেল, হুবহু নাট্যকারের সংলাপই বলে-ছেন তিনি। তাহলে নাট্যকারের এমন মনে হল কেন?

কারণটা বোধহয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। দানীবাবুর অভিনয় বৈশিষ্টে সাধারণ সংলা-পও অগ্নিময়ী বাণীর রূপ নিয়েছিল। এহেন শক্তিমান অভিনেতাকে অস্বাভাবিক অভিনয় করার দোষে দোষী করা চলে কি।

অস্বাভাবিকের অর্থ হল যা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু অভিনয়ের মূলে আছে রূপ আরোপ করার কথা। আরোপিত কোন কিছুর মধ্যে স্বাভাবিকত্ব থাকেনা, থাকা সম্ভবও নয়। রূপা-রোপকে মানা না মানা প্রয়োজন বা পারিপার্শ্বিকের ওপর নির্ভর করে। যেমন, মানুষের স্বাভা-বিকরূপ তার নগ্নরূপ, কিন্তু সামাজিক বিধি নিষেধ আমাদের পোষাক পরতে বাধ্য করে। শীতের দেশে গরম পোষাক আর গরমের দেশে পাতলা পোষাক পরাই সাধারণ নিয়ম। ওটাকে প্রয়োজন বলা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করলেই তাকে অস্বাভাবিক বলে করার অধিকার আমাদের জন্মায় কোথা থেকে? আরবের মরুভূমিতে গরমের দিনেও গরম পোষাক পরতে হয়, নাহলে অত্যধিক রোদের তেজে গায়ে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা, অথচ শ্যামলা বাঙলা দেশে যত গরমই হোক না কেন, গরমের দিনে গরম পোষাক পরা নিছক পাগলামি বলে মনে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অবস্থা অনুসারে প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ড পালটাতে হয়।

অথচ আজকের দিনে স্বাভাবিক অভিনয়ের যে নতুন ধুয়ো উঠেছে তাতে এই প্রয়ো-জনীয়তাকে স্থিতিশীল করবার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। স্বাভাবিক অভিনয়কে স্বীকার করলেও কাকে স্বাভাবিক বলব এনিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে।

এবিষয়ে আমাদের দেশে ষ্টানিস্লাভস্কির দোহাই পাড়া হয়। ষ্টানিস্লাভস্কির মূল লেখা আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু নানা সূত্রে তাঁর মতের যে খণ্ডাংশ আমি পেয়েছি তাতে তাঁর মতকে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তাঁর ভক্তস্থানীয় কোন বিদেশী সমালোচকের লেখায় তাঁর অভিনয় প্রণালীর যে বিশ্লেষণ পড়েছিলাম তাতে উল্টো কথাই মনে হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন যে, কোন নারীকে দেখে হয়ত মনে কামনার আগুণ জ্বলবার কথা কিন্তু অভিনেতার অভিনয়ে সে ভাবটা পরিস্ফুট হচ্ছেনা; এ অবস্থায় অভিনেত্রীর বদলে অভিনেতার প্রিয়তর কোন কামনার বস্তুকল্পনা করে নিলেই নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব ফোটানো সম্ভব হবে।

এ মতবাদ শুধু যে অগ্রহণীয় তাই নয় অশ্রদ্ধেয়ও বটে। অভিনয় করবার সময় অভিনেতা যদি চরিত্রের দোষগুণ ফুটিয়ে তুলতে না পারেনত কিসের অভিনেতা তিনি? সত্যকারের অভি-

নেতা অভিনেতব্য চরিত্রের অতলে ডুব দিয়ে নিত্য নতুন রূপের সন্ধান পাবেন, কাজেই চরিত্রে কামের প্রাধান্য থাকলে নানা ভাবে তার প্রকাশ ঘটবে তাঁর অভিনয়ে। নয়ত কামভাব মেটাবার জন্যে ভাবতে হবে, এনহে নারী এ রসেগোল্লার হাঁড়ি আর রসনা লালসিক্ত হয়ে উঠবে—এ প্রণালী কি সহজ না উত্তম না স্বাভাবিক?

অবশ্য স্বাভাবিক অভিনয়ের অন্যতর পুরোধা জার্মানীর বার্থল্ট ব্রেখ্টের বক্তব্য আমার কাছে অনেক বেশী সুবোধ্য মনে হয়। কোন এক নাটকে শ্রীমতী বোল্টের মেছুনির ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা। বারবার রিহার্সালে যখন তিনি ভূমিকাটির মনোমত রূপ ফোটাতে পারলেন না, তখন ব্রেখ্ট তাঁকে বাজারে গিয়ে মেছুনিদের হাবভাব লক্ষ্য করে আসতে বলেন, আর তাতে ঈপ্সিত ফলও পাওয়া যায়।

উল্টো দৃষ্টান্ত কিন্তু হাতের কাছেই আছে। আবার শিশিরকুমারের কথায় বলি—আমাদের এক মধ্য সাপ্তাহিক প্রহসনে ও (শ্রীমতী প্রভা) একটা গোঁয়ো মেয়ের পার্ট করেছিল। স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার যাচ্ছে, মাথায় একগলা ঘোমটা, পা থেকে চটি খুলে খুলে যাচ্ছে, রাস্তায় থমকে দাঁড়াচ্ছে আবার স্বামী ডাকলেই ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে—একেবারে খাঁটি গেঁয়ো মেয়ে। অথচ গ্রাম ও দেখেইনি বললে হয়।

অনুকরণ বা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া গেলেও অপূর্ব কিছু হওয়া সম্ভব নয়, কারণ, অনুকরণ বা অনুসরণ কখনো সাধারণ ভালোর ওপরে বেশ ভালো বা অত্যন্ত ভালোর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়। যা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতোৎসারিত তাই প্রিয়তর বা সুন্দরতর হয়। একে স্বাভাবিক বললে তর্ক করবনা বরং মেনেই নেব। সেই জন্যেই শিশির কুমার প্রবর্তিত সহযোগী অভিনেতার দিকে ফিরে কথা বলার রীতি আমি সমর্থন করি, কারণ কঠিন হলেও ঐভাবে অভিনয় করতে পারলে তা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়।

স্বাভাবিক অভিনয়ের পক্ষপাতীদের কিন্তু এদিকে নজর নেই, তাঁরা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে অভিনয় করতে প্রস্তুত, কারণ তাহলে সংলাপ শোনানো সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁদের মতে অভিনয় হবে রিয়েলিস্টিক।

এই রিয়েলিজিমের মোহ আমাদের এতই বশীভূত করেছে যে আমরা ভুলে যাই রিয়েলিস্টিক সৃষ্টিই প্রকৃত সৃষ্টি নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে সৌন্দর্য, যে সুষমা বর্তমান রিয়েলিজমে তা সব সময়ে থাকেনা। তা যদি থাকত তাহলে সংবাদই হত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু একথা যে সত্য নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

তাছাড়া সুকুমার কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন রিয়েলিজমকে ত্যাগ করার প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে, তখন যেখানে রিয়েলিজিমের ঠাঁই ছিলনা সেখানে রিয়েলিস্টিক হবার সাধ কেন? একি কল্পনার দৈন্যের দ্যোতক, না সৃষ্টির বাজারে দেউলিয়া একথা প্রকাশিত হবার ভয়, কিম্বা চলচ্চিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবার জন্যে নাটকের নবরূপ সৃষ্টি।

কারণ যাই হোক, স্বাভাবিক হবার এপ্রচেষ্টা সানন্দে স্বাগত করবার নয়। যা সুন্দর যা মনোহর তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিতান্ত গতানুগতিককে মেনে নেওয়াতে, ক্ষণিক উত্তেজনারই উপকরণ মাত্র জোটে। উত্তেজনা সাময়িক কিন্তু পরবর্তী অবসাদ দীর্ঘস্থায়ী। বাঙলা নাট্যশালায় সেই দীর্ঘ অবসাদের সূচনা দেখা দিয়েছে। অতএব সাধু সাবধান।

রবি মিত্র

রবীন্দ্রস্মৃতি ।। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ॥ বিশ্বভারতী। মূল্য ২ টাকা।

মানুষ আসে মানুষ যায় কবি তো বলেইছেন men may come and men may go. বড় বড় মানুষও আসেন। যাঁরা চলে গেলে হায় হায় রব ওঠে জগতে। মানুষের ভাল করেন তাঁরা—এগিয়ে দেন ইতিহাসকে সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও। শুধু আসে যায় যে মানুষ ইন্দিরা দেবী তাঁদের একজন নন। আবার ইতিহাসকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন সে কাজও তাঁর নয়। তবু ইন্দিরা দেবী নেই, এতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করলুম কেন?

দেবেন ঠাকুর থেকে অবন ঠাকুর—একশো বছর কত কাণ্ডই ঘটেছে বাংলাদেশে। যাঁরা তাঁদের কাউকে কাউকে বা তাঁদের কার্যকলাপ চোখে দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন জীবনের গৌরবোজ্জ্বল সমন্বিতি; বীর্যবান মনীষা, তাঁর ধীশক্তি আর হৃদয়ানুভূতির সমন্বয়ে জাত বিচিত্র সৃজনীশক্তি। যারা তা দেখতে পেলনা, অথচ যাদের উপর সেই সমন্বিতির আলো পড়েছে তাদের আছে কৌতূহল।

সেই আগুণজ্বালা যুগ, আর আমাদের এই ঝিমিয়ে পড়া যুগের মধ্যে ইন্দিরা দেবী, ছিলেন সেতু। তাঁর স্মৃতির মণিকোঠা থেকে অঞ্জলি ভরে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ তিনি কেবলই এ যুগের মানুষকে এনে দিয়েছেন। বিচিত্রবীর্য প্রতিভাবান স্রষ্টাদের কথা বলতে তাঁর ক্লান্তি ছিলনা। তাই টুকরো টুকরো অজস্র ছড়ানো লেখায় সে কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান একসময়ে তিনি কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, স্বরলিপিও অনেক লিখেছিলেন শেষ পর্যন্ত সেই গানের সুর আরও কত কণ্ঠে ছড়িয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আরও কত গান ছিল—সে সুর কেউ লিখে নেয় নি। ভরাডুবি হয়ে গেল—সে সুর কি আর ফিরবে কোনদিন।

তাঁর উপরে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ বর্ষিত হয়েছে অজস্রধারে। বয়স যখন কম, যখন সব গভীর কথা বোঝবার সময় হয়নি তখনই কবির পদ্মাবিলাসী মনের অজস্র প্রকাশ হয়েছে এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লক্ষ্য করে। ছিন্নপত্র যে ইন্দিরাদেবীকে লেখা তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে শুধু স্নেহ নয়, এই মনের গভীরতা সম্বন্ধেও কবির কোন সংশয় ছিলনা। সেদিন কবির যত ভাবনা যত অনুভূতি ঐ চিঠিগুলির মাধ্যমে অন্য হৃদয়ে আশ্রয় চেয়েছে-সে হৃদয়, সে বোদ্ধা মন ছিল ইন্দিরা দেবীর।

যাঁরা রবীন্দ্রভক্ত ইন্দিরা দেবী তাঁদের ঘরের লোক। তাঁকে আমরা জানি, চিনি, আপন জন বলে অনুভব করি। কবির গান, কবির নৃত্যনাট্য, কবির সৌন্দর্যসাধনার তিনি ব্যাখ্যা করে, অর্থ করে পৌঁছে দিয়েছেন যতদিন ছিলেন। যে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতার সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল তা যক্ষের ধনের মত আগলে রাখেন নি, তা ছড়িয়ে দিয়েছেন দুহাতে। তাই আমরা তাঁকে আপন বলে জানি।

তবে শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জড়িয়ে দেখার বিপদ আছে—দীপ্ত সূর্যের পাশে স্নেহধন্য প্রদীপ নিজের আলোটুকু কেমন করে দেখাবে। যেদিন কবি রইলেন না সেদিন যে কটি মানুষকে দেশে দেখতে পেলুম কবির বাণীর ধারক ও প্রচারক হিসাবে তিনি তাঁদের একজন। তাঁর দক্ষতা

শুধু গানে নয়, শুধু ফরাসীভাষায় নয় তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব জীবন সন্ধানে। জীবনের সৌন্দর্য-সাধনে, জীবনে অর্থসঞ্চারণে যে সব শিল্পীদের প্রয়াস নিরন্তর তিনি ছিলেন সেই জাতের। তাঁর রচনা অল্প কিন্তু অল্পমূল্য নয়। বাংলা সাহিত্য তাঁকে আসন দেবে এইজন্য যে তিনি যা লিখেছেন তা শুধু ভাবের ফসল নয় স্বচ্ছ বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার থেকেই তার জন্ম।

ইন্দিরাদেবীর মৃত্যু অকাল মৃত্যু নয়। পরিণতির প্রসাদ নিয়েই তিনি গেছেন। আমাদের মনে তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা রইলো। সম্প্রতি হাতে এসে পড়লো তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি'। ইন্দিরা দেবী তাঁর শেষ দান রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাহিনী ভরে দিয়েই। সংগীত, কাব্য, নাট্য, ও পারিবারিক স্মৃতিতে এই কাহিনীগুলি ভাগ করা হয়েছে। সবসময়ে যে কালগত পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে তা নয়। আগের ঘটনা পিছনে এবং পিছনের ঘটনা আগে চলে গেছে। তাতে ক্ষতি নেই কারণ এতো ইতিহাস নয়। একটি নিবিড় সান্নিধ্যের স্নেহস্পর্শে এর পাতায় পাতায় যা আমাদের মনেও একটি ভাবাবেশ সঞ্চারিত করে তোলে। এর মূল্য সেইখানেই।

মঞ্জুলা বসু

রবির আলো। মণি বাগচি। চিনকো, ১৬৭ এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-১৯। দাম তিনটাকা।

পৃথিবী যে সুন্দরী, পৃথিবীতে যে ভালো আছে, মন্দ আছে, আছে প্রত্যহের দীনতা হতে মানবাত্মার অমৃতত্বে উত্তরণ এ খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দেন কবি। কবি কেবল সুন্দরের বাণী, আনন্দের অক্ষরে মনের পাতায় লিখবার ভার পাওয়া মধুবিলাসী নন। তাঁর কর্তব্য দুরূহ। ভালোবাসার কথাটি বলতে শেখার জন্য আমরা কবির স্বারস্থ হই; আবার অন্যায়কে, পাপকে শাসনের ভাষাও থাকে কবির লেখনীতে।

ভারতে নবজাগরণের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম উদয় যেমন উদার, পশ্চিমদিগন্তে বিলয়ও তেমনি মহিমময়। অংশুমালীর আকাশ পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সমাচার দিয়েছেন মণি বাগচি তাঁর "রবির আলো"তে।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি। আমাদের বিশ্রাম আনন্দঘন হয়ে ওঠে রবীন্দ্র কাব্য আস্বাদনে, গুরু প্রবন্ধে কোটেশন দেই রবীন্দ্র-বাক্য, দেশের সেবায়, মানব সেবায় বার বার স্মরণ করি শতাব্দীর ঋষিকে। যে ভালোবাসার পাত্রকে আমরা মলিন উত্তরীয় প্রান্ত পেতে দেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের ঠিক তেমনটি আটপৌরে ভালোবাসার ধন নন।

রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসার সঙ্গে রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা আর সেই হীরায় সোনায় জড়ানো অনুরাগ আমাদের নিজেদের প্রতিও শ্রদ্ধাবান করে তুলছে। কতজয়ন্তী হয় প্রতিমাসে, তাতে ভীড় আছে, ভড়ং আছে, মাইকও আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা কই! রবীন্দ্র জয়ন্তীর অন্যরূপ। প্রতি উপলক্ষ্যে যারা দেখা দেয় নানা উচ্ছৃঙ্খলতায়, রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে তারাই হয়ে ওঠে সৌম্য, সুন্দর।

শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ, রজনীগন্ধা আর চন্দন ধূপের অভ্যর্থনা রচনা করে আমরা রবীন্দ্র স্মরণ করি। যে প্রেম প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিককেও বিস্তৃতি দেয় কবির প্রতি আমাদের সেই প্রেম এবং এই শ্রদ্ধানত অনুরাগের একটি নূতন স্বাক্ষর "রবির আলো"।

বাতায়নের অবকাশ সংক্ষিপ্ত, তবু তারি মারফৎ পৃথিবীর খবর পৌঁছে যায় অন্দর মহলে। লেখকের মানসগবাক্ষেও কবির কোনো বিভূতি ধরা পড়তে বাকী থাকেনি।

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব আজ মনোলোকে। প্রত্যহের দাবী তার উপর বিস্মৃতির জাল বুনতে চায়। বর্তমানের শিল্পীদের মস্তবড় কাজ হলো তাঁদের তুলির রেখায় কবিকে বারবার স্মরণ হতে বাইরের জগতে প্রকাশ করা। বিদগ্ধজন তাঁদের কর্তব্যকর্মে অবহিত, শ্রীবাগচিও সেই কাজই নিয়েছেন।

মনে হয় বইখানি লিখবার সময় কিশোর কিশোরীদের মুখই লেখকের মন জুড়ে ছিল। যে চঞ্চল বয়স কবির বিস্তৃত জীবন-কথা পড়তে বসে ধৈর্য্য হারাতে চাইবে তাদের হাতেই লেখক যেন তুলে দিতে চেয়েছেন তাঁর "রবির আলো।"

গ্রন্থের ভাষা বিষয়-মাধুর্যের অনুকরণ করেছে। সূচনাটি এমন যে কেবল সংস্কৃতিকেন্দ্র "ঠাকুরবাড়ী" নয়, সেদিনের বাংলা ও বাঙ্গালীও চকিতে একবার দেখা দিয়ে যায়। কৌতূহলীমন সেই যুগসন্ধির সূচিপত্র দেখে বিস্তৃত পরিচয় পাবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবে।

লেখার বিষয় ও লেখকের প্রতিভার পক্ষে রবির আলো বড় সংক্ষিপ্ত। লেখক বড় তাড়াহুড়ো করে গ্রন্থ খানি শেষ করেছেন। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর, অভিনবত্বের দাবী রাখে। উপরে বইয়ের নাম না থাকলে, কেবল আলো ঝলমলে শাখাটিই গ্রন্থের পরিচয় বহন করতো।

নমিতা চক্রবর্তী

বাংগালা ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥ অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ক্যালকাটা বুক হাউস। ২৪৫ পৃঃ মূল্য আট টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের বিশেষভাবে নবযুগের ইতিহাসের সীমারেখা এবং বিস্তৃতি একরকম নির্ধারিত হয়ে গেছে। তার উপর ভিত্তি করে এখন যে এক একটি ধারার গভীরতর আলোচনা সম্ভব, তাও কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এখন এমন অবস্থা হয়নি, যাতে ঐরূপ আলোচনা আমাদের অভাব সম্পূর্ণরূপে মেটাতে পেরেছে। তাই এই দিকে সকল রকম সৎপ্রচেষ্টাকেই অভিনন্দিত করা উচিত।

নবযুগের বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে একদিক দিয়ে উপন্যাস ও ছোটগল্প সর্বাধিক জনপ্রিয়। উপন্যাসের ধারা ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সকল ধারাকে গভীর ও ব্যাপক ভাবে আলোচনার ক্ষেত্র নাই; তাই তিনি ঐ কাজে অগ্রসর হন নি। শ্রীকুমার বাবু যে পথ দেখিয়ে গেছেন, অপর্ণা বাবু সেই পথ অবলম্বন করে আলোচনাকে অনেক দূর অগ্রসর করেছেন। তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টা অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। এই কারণেও অপর্ণাবাবু অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

বাঙলা ভাষায় পূর্ণাংগ উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাসকে অবলম্বন করে। এটা যুগধর্মের অনুসৃতি, না একটা আকস্মিক ঘটনা তা সমসাময়িক পরিবেশ আলোচনা করেই বিচার করতে হয়। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান কতখানি, আর উপন্যাসের স্থান কতখানি, সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা যায় কিনা, ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে কতদূর পর্যন্ত পরিবর্তন করার স্বাধীনতা পাবেন সে সম্বন্ধে কোন আদর্শ নিয়ম আছে কিনা,

প্রভৃতি নানা প্রশ্ন পাঠক তথা গবেষকের মনে জাগে। অপর্ণাবাবু তাঁর আলোচনার পটভূমি রূপে এই তত্ত্বের দিক ভালো ভাবেই আলোচনা করেছেন। বৈদেশিক আদর্শের কথা মনে রেখেও ভারতীয় ভাবাদর্শের কথা বিস্মৃত হননি।

অপর্ণাবাবুর আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত। বাঙলা উপন্যাসের প্রথম থেকে আধুনিকতম কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস তাঁর আলোচনায় উপযুক্ত স্থান পেয়েছে। উপযুক্ত বলার কারণ এই যে, একটা সাহিত্যের ইতিহাসে কার স্থান কতখানি তা নির্ধারিত হয় সাহিত্যিকের ব্যক্তি-সত্তা অথবা রচনারীতির বিচারেই নয়, উপরন্তু তাঁর সাহিত্যের ভাবধারার স্বরূপের উপর। একটা ধারার প্রসার ও বিস্তার আলোচনা করার সময়ে কারো বিষয়ে বেশি, কারো বিষয়ে কম আলোচনা সেই কারণেই হয়ে থাকে। অপর্ণা বাবুর আলোচনায় এরূপ অনেক বিস্মৃত ঔপন্যাসিকের স্থান যেরূপ বিস্তৃত, তাতে অনেকের সংশয় হতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের কাহিনী গঠনে এবং জটিল করে তুলতে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন তা যতক্ষণ ঠিকভাবে নির্ধারণ করা না যায়, ততক্ষণ তাঁর বিষয়ে আলোচনা করাই স্বাভাবিক। একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, এদিক থেকে অপর্ণা বাবুর মাত্রা জ্ঞানের অভাব নেই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে বংকিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যে বিস্তৃত এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে তার তুলনায় রমেশচন্দ্রের সম্পর্কে আলোচনা কম। আবার, রমেশচন্দ্রের বিষয়ে যে পরিমাণ আলোচনা আছে তার তুলনায় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা অনেক বেশি। অপর্ণাবাবুর আলোচনা অনুধাবণ করলে দেখা যাবে যে বংকিম তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার করার আদর্শ নানাভাবে পরিবর্তন করেছিলেন, রমেশ-চন্দ্র একই আদর্শ অনুসরণ করেছেন, আর রাখাল দাস একটা স্বল্প-জ্ঞাত যুগকে প্রত্যক্ষ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা কৌশল অবলম্বন করেছেন।

শেষ কথা, অপর্ণাবাবুর গ্রন্থটিতে মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কোথাও "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত" নাই। প্রত্যক্ষ পরিচয় লব্ধ জ্ঞানের সংগে গভীর বিশ্বাস তাঁর রচনাকে সরল, সহজ বোধ্য করে তুলেছে। বাঙলা সাহিত্যে অনুরাগী মাত্রেই গ্রন্থখানিকে মূল্যবান অবদান রূপে স্বীকার করবেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

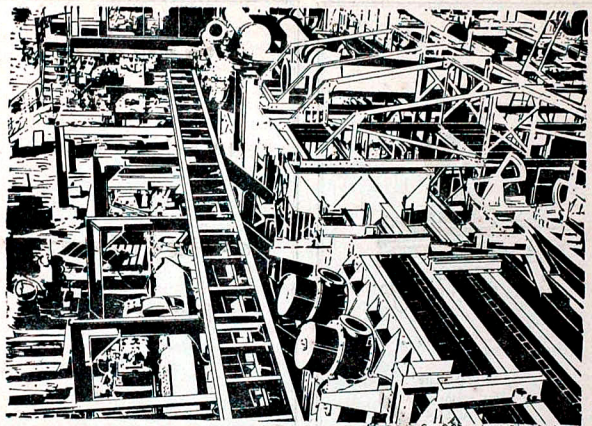

মিডিয়াম সেকশন্ মিল—রি-হিটিং ফার্নেস এবং মিল রান-ইন টেবল

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য এবং উৎপাদন পাশাপাশি চলেছে

রোলিং মিলের শেষ দু'টি ধাপ— মিডিয়ম সেকশন মিল এবং মার্চেন্ট মিল এ দু'টি কারখানাই বর্তমানে সম্পূর্ণতার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এ ছাড়া আরো তিনটি রোলিং মিল ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে চালু করা হয় এবং সেগুলি এখন পুরোদমে উৎপাদন করছে। এই দু'টি নতুন রোলিং মিল দুর্গাপুর কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাকশন্ কোং লিঃ

ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইন্‌ডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেক্‌ট্রিক্যাল (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এ্যরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেব্‌ল গ্রুপ (সিমেন্স এডিসন স্বোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেব্‌ল ওয়ার্কস্ লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ISCON-29 BEN